দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

৬৬ বর্ষ, ৪২ সংখ্যা।। ৩০ জুন - ২০১৪।।
১৫ আষাঢ় - ১৪২১।। website : www.eswastika.com

ধারা ৩৭০ ?

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৯

পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রতিককালের রাজনৈতিক দাঙ্গার চরিত্রটি পুরোপুরি সাম্প্রদায়িক ▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ১০

খোলা চিঠি : নবান্নে কুচকাওয়াজ লেফট রাইট লেফট রাইট ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ১১

প্রসঙ্গ ৩৭০ নং অনুচ্ছেদ ▯ ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত ▯ ১২

ধারা ৩৭০ সংক্রান্ত কয়েকটি লক্ষণীয় বিষয় ▯ মাধব গোবিন্দ বৈদ্য ▯ ১৪

ধারা ৩৭০ কি সত্যিই জরুরি ? ▯ অজেয় ভারতী ▯ ১৬

ধারা ৩৭০ সাম্প্রদায়িকতার কাছে আত্মসমর্পণ ▯ এস গুরুমূর্তি ▯ ১৮

বাংলায় এবার রাজনৈতিক 'সিন্ডিকেট' তৈরি হলো ▯ শ্যামলকুমার হাতি ▯ ২০

দশাবতার ও ভারতের জাতীয় জীবন : বরাহ-অবতার ▯ ড: ইন্দ্রজিৎ সরকার ▯ ২১

গান্ধী-জননী পুতলীবাঈ ▯ রুপশ্রী দত্ত ▯ ২৩

ওবামার কালো তালিকায় থাকা মোদী একদম সাদা স্লেট নিয়েই শুরু করলেন ▯ স্বপন দাশগুপ্ত ▯ ২৭

এবার একটু বুকভরা নিঃশ্বাসের আশা ▯ বাক্‌পতি মিশ্র ▯ ২৯

বিষম ধাতুর মিলন ঘটায়ে বিজেপি দিয়েছে বিয়া ▯ অমলেশ মিশ্র ▯ ৩২

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

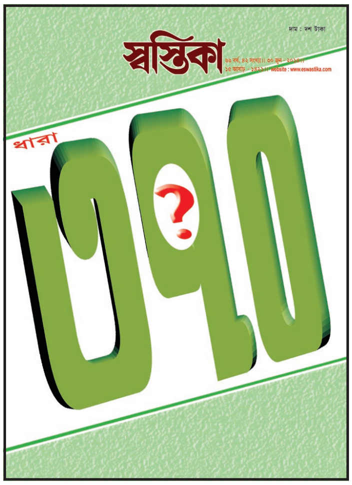

পৃঃ - ১৪-১৮

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯ ▯ নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ ▯ অঙ্গনা : ২৬ ▯

অন্যরকম : ৩৩ ▯ সমাবেশ-সমাচার : ৩৫-৩৭ ▯ রঙ্গম : ৩৮ ▯

▯ খেলা : ৩৯ ▯ শব্দরূপ : ৪০ ▯ চিত্রকথা : ৪১

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৬ বর্ষ ৪২ সংখ্যা, ১৫ আষাঢ়, ১৪২১ বঙ্গাব্দ

যুগাব্দ - ৫১১৬, ৩০ জুন - ২০১৪

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

সার্কুলেশন : ৭২৭৮৪১৭৩১৬
৮৬৯৭৫২১৪৭৯

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪,
৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

Postal Registration No.-
Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
৭ই জুলাই
২০১৪

ভারতকেশরী
ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের
জন্মদিনে শ্রদ্ধার্ঘ্য

ভারতীয় জনসঙ্ঘ থেকে বিজেপি

ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের চিন্তাধারা যতদিন যাচ্ছে ততই দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এবারে তাঁর প্রতিষ্ঠিত দল ভারতীয় জনসঙ্ঘ-এরই বর্তমান রূপ ভারতীয় জনতা পার্টি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে কেন্দ্রে সরকার গঠন করেছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় জনসঙ্ঘ থেকে ভারতীয় জনতা পার্টির বিবর্তনের রূপরেখা এই সংখ্যার স্বস্তিকায় তুলে ধরা হবে। সেইসঙ্গে থাকছে পশ্চিমবঙ্গের শাসক দলগুলির পশ্চিমবঙ্গের স্রষ্টাকে নিয়ে উদাসীনতা— এককথায় যা লজ্জাজনক। লিখেছেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সহ-সভাপতি দুর্গাপ্রসাদ নাথানী, দিলীপ চট্টোপাধ্যায়, অম্লানকুসুম ঘোষ প্রমুখ।

প্রকাশিত হবে ৭ জুলাই ২০১৪।। দাম দশ টাকা।।

HB ®
INDIA'S NO. 1 IN
ISI MARKED
HEAVY PIPE FITTINGS

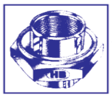
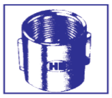

HB ®
AN ISO 9002 CERTIFIED CO.
Authorised Distributor
NATIONAL PIPE & SANITARY STORES
54, N. S. Road
Kolkata-700001
Ph : 2210-5831/5833
3, Jadu Nath Dey Road,
Kolkata-12, Ph. 2215-6804,
Fax : 2212-2803
Sister Concern
Partha Sarathi Ceramics
4, College Street,
Kolkata-700012
Ph: 2241 6413 / 5986
Fax : 033-22256803
e-mail : nps@vsnl.net
website ;
www\nationalpipes.com

সানরাইজ ®
সর্ষে পাউডার

SUNRISE ® PURE
স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

রেলভাড়া বৃদ্ধি যুক্তিযুক্ত

মোদী সরকারের বর্ধিত রেলভাড়া প্রত্যাহারের দাবিতে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিক্ষোভ চলিতেছে। বিভিন্ন দল সরকারের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই আন্দোলনে নামিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু কেন এই আন্দোলন? ভারতীয় রেল পৃথিবীর বৃহত্তম রেল পরিষেবা বলিয়া স্বীকৃতি পাইয়াছে অথচ প্রতি মাসে নয়শত কোটি টাকা লোকসানে চলিতেছে। এই লোকসানের বহর রোজই বাড়িয়া চলিতেছে। এইভাবে চলিলে অচিরেই রেল পরিষেবা ধ্বংস হইয়া যাইবে। মোদী সরকার ধ্বংসের হাত হইতে রেলকে বাঁচাইতে প্রচেষ্টা লইয়াছে মাত্র। রেল পরিষেবাকে ধ্বংস করিবার পিছনে পূর্ববর্তী সরকার এবং তাঁহাদের রেলমন্ত্রীরা কম দায়ী নন। তৃণমূলের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও মুকুল রায়, আর জে ডি-র লাল প্রসাদ যাদব ও নীতিশ কুমারের ভূমিকা এই ক্ষেত্রে কম দায়ী নয়। তাঁহারা মন্ত্রী থাকিবার সময়ে রেলমন্ত্রককে পৈতৃক সম্পত্তি মনে করিয়া রেলমন্ত্রক হইতে নিজের ও দলের জন্য রাজনৈতিক ফায়দা লুটিয়াছেন। যাহার ফলে যুক্তি ছাড়াই অহেতুক অপ্রয়োজনীয় ট্রেন চালাইয়া নিজেদের রাজ্যে রাজনৈতিক ছবি উজ্জ্বল করিয়াছেন। ইহাতে রেল পরিষেবার উন্নতি হয় নাই বরঞ্চ লোকসানের বহর বাড়িয়াছে মাত্র। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে হাওড়া ব্যাণ্ডেল মহিলা স্পেশাল চালাইবার যুক্তি আছে কি? এই লাইনে অন্য গাড়ি রহিয়াছে। সেইখানে মহিলা কামরা বাড়াইলে এই মহিলা স্পেশালের আর প্রয়োজন হয় না। কিন্তু রেলমন্ত্রী থাকিবার কালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মহিলাদের জনমোহিনী অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করিয়া রাজনৈতিক সুবিধা ভোগ করিয়াছেন। সস্তায় বাজিমাত করিতে গিয়া বিগত এক দশকের বেশি রেলভাড়া বাড়ানো হয় নাই, বরঞ্চ লালুপ্রসাদ ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মন্ত্রী থাকিবার কালে দুইবার রেলভাড়া কমাইয়াছেন। বিগত ইউপিএ সরকারও রেলের ভাড়া বৃদ্ধি লইয়া সিদ্ধান্ত হীনতায় ভুগিতেছিল। রেলের ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাব করিয়াও কেবলমাত্র ভোট হারাইবার ভয়ে তাহা প্রত্যাহার করিয়াছিল। রেলের আধুনিকীকরণ ও যাত্রীসুরক্ষার জন্য যে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তাহা জোগাড় করিবার জন্যই রেলভাড়া বৃদ্ধির প্রয়োজন। পূর্বের মতো জোড়াতালি দিয়া যাত্রীভাড়া না বাড়াইয়া কেবলমাত্র দ্রব্য পরিবহণ শুল্ক বাড়াইলে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অন্য পরিবহণ ব্যবস্থার তুলনায় রেল আরও আকর্ষণ হারাইত। বরঞ্চ তাহার প্রভাব পড়িত আয়ের উপর। ভাড়া না বাড়াইলে রেলের উন্নতি, যাত্রীস্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। একটু তলাইয়া দেখিলেই বোঝা যাইবে এই সিদ্ধান্তের পিছনে যথেষ্ট যুক্তি ও কৌশল আছে। তবে বর্ধিত ভাড়ার ফলে লব্ধ আয় যাহাতে আধুনিকীকরণ এবং যাত্রীসুরক্ষা ব্যবস্থার কাজে ব্যবহৃত হয় তাহাও নিশ্চিত করা প্রয়োজন। যদি যাত্রী পরিষেবা উন্নততর হয় তবে ভাড়া বৃদ্ধিতে ক্ষুব্ধ হইবার কোনো কারণ থাকিতে পারে না। কিন্তু তাহা কোনোদিন হয় নাই বলিয়াই আন্দোলন বিক্ষোভ। রেলের লোকসান কমাইতে হইলে রেল প্রকল্পগুলির পুনর্মূল্যায়নও প্রয়োজন। দেখা যাইতেছে যথাযথ সমীক্ষা ছাড়াই কেবল রাজনৈতিক প্রয়োজনে বহু প্রকল্পের ঘোষণা করা হইয়াছে। তৃণমূলের সময়ে এমন সব প্রকল্প হাতে লওয়া হইয়াছিল যাহার সঙ্গে রেল পরিষেবার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল না। মনে রাখিতে হইবে বছরে ২৬ হাজার কোটি টাকা ভরতুকি দিয়া রেল পরিষেবা দিনের পর দিন চালু রাখা কোনো সরকারের পক্ষেই সম্ভব নয়। দ্রব্য পরিবহণের ক্ষেত্রে রেল যাহাতে সড়ক ও বিমান পরিবহণের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সক্ষম হয় সেইদিকেও দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। এই প্রতিযোগিতা বৃহত্তর অর্থনীতির পক্ষে সার্বিক ভাবে মঙ্গলজনক।

সুভাষিত

অবিদ্যাং জীবনং শূনং দিক্‌শূন্যা চেদবান্ধবাঃ।
পুত্রহীনং গৃহং শূন্যং সর্বশূন্যা দরিদ্রতা।। (চাণক্য নীতি)

বিদ্যা না থাকা মানে জীবনশূন্য, বন্ধু-বান্ধব না থাকা মানে সকল দিক্‌শূন্য। যে গৃহে সন্তান নেই সেই গৃহ শূন্য এবং যে দরিদ্র তার সব কিছুই শূন্য।

পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালনে দাবি উঠল এ রাজ্যে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ২০ জুন কলকাতার থিওসফিক্যাল সোসাইটি হলে 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালিত হলো। অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ছিল 'পশ্চিমবঙ্গের জন্য' নামের একটি ফোরাম। সভায় বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক অচিন্ত্য বিশ্বাস, সাংবাদিক রন্তিদেব সেনগুপ্ত, রাজনীতিবিদ তথাগত রায়, লেখিকা এষা দে ও পরিবেশবিদ মোহিত রায়। ১৯৪৭ সালের ২০ জুন বঙ্গীয় আইনসভা ভেঙে মুসলমান প্রধান অঞ্চল নিয়ে পূর্ববঙ্গ আইনসভা ও অমুসলমান

বক্তব্য রাখছেন তথাগত রায়। মঞ্চে (বাঁ দিক থেকে) রন্তিদেব সেনগুপ্ত, অচিন্ত্য বিশ্বাস ও এষা দে।

প্রধান অঞ্চল নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ আইনসভা গঠিত হয়েছিল। ওই দিনই পশ্চিমবঙ্গ আইনসভার সদস্যরা ৫৮—২১ ভোটে বাংলা ভাগের ও ভারতে যোগদানের পক্ষে ভোট দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ নামে ভারতের একটি অঙ্গরাজ্য গঠন নিশ্চিত করেন। সেদিনটিকে স্মরণ করেই তাঁদের এই আয়োজন বলে উদ্যোক্তরা জানিয়েছেন। অনুষ্ঠানে বক্তারা সকলেই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গঠনের জন্য ভারত কেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কাঁধেই এর যাবতীয় কৃতিত্ব অর্পণ করেন। ইতিহাসও সাক্ষ্য দেয় যে শরৎচন্দ্র বসু, কিরণশঙ্কর রায়দের ভ্রান্ত মত ও পথের বিরুদ্ধে আশুতোষ পুত্রের অসামান্য লড়াই-ই বাঙালি হিন্দুদের একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই অন্তত জোগাড় করে দিয়েছিল। এই ইতিহাসের প্রচারে যিনি আমরণ সংগ্রাম করেছেন সেই বিশিষ্ট প্রাজ্ঞজন সদ্য প্রয়াত ডঃ দীনেশ চন্দ্র সিংহকেও স্মরণ করেন উদ্যোক্তাগণ।

'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' পালনের প্রেক্ষাপট পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনার মাধ্যমে উপস্থিত করতে গিয়ে মোহিত রায় স্মরণ করিয়ে দেন : 'পশ্চিমবঙ্গ শুধু একটি স্থানমাত্র নয়, পশ্চিমবঙ্গ হলো বাঙালির মুক্ত অস্তিত্বের ভাবনা।' অন্নদাশঙ্কর রায়ের একটি উক্তির স্মরণ করিয়ে দেন তিনি : '১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন যেন মুসলমান আমলের পুনারম্ভ। বিগত ছ'সাত বছরে তসলিমা নাসরিন বিতাড়ন থেকে শুরু করে, দেগঙ্গা, কামদুনি থেকে কাটোয়া, ক্যানিং প্রভৃতি এলাকায় হিন্দুদের ওপর যেভাবে লাগাতার আক্রমণ হচ্ছে তার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি প্রশ্ন তোলেন, — এরপর হিন্দুরা যাবে কোথায়? বাঙালি হিন্দুর অস্তিত্বের জন্য হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল গঠন, সেই অঞ্চলের শাসনভার হিন্দুদের হাতে থাকা ও সর্বোপরি ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে তাদের লিপ্ত থাকা একান্তই দরকার বলে মনে করেন মোহিতবাবু।

তথাগত রায় তাঁর বক্তব্যে একটি পরিসংখ্যান তুলে ধরে জানান স্বাধীনতার সময়ে বাংলাদেশে হিন্দু ছিলেন ২৯ শতাংশ। আজ তা ৮-৯ শতাংশে গিয়ে ঠেকেছে।

অচিন্ত্য বিশ্বাস বলেন, যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল দলিতদের খারাপ অবস্থার ধুয়ো তুলে বাংলা ভাগ হবে না বলে দাবি করলেও হিন্দু দলিত সমাজের পক্ষে এর সবটাই সত্যি ছিল না। তাঁর বক্তব্য দেশভাগে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বাঙালি হিন্দু দলিত সমাজই। তাঁদের ছিন্নমূল উদ্বাস্তু হয়ে ছড়িয়ে পড়তে হয়েছে পিলভিট, আন্দামান, মালকানগিরি কিংবা দণ্ডকারণ্য অঞ্চলে। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে ত্রিপুরায় বিপুল পরিমাণে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ হচ্ছে। আর ত্রিপুরার জনগোষ্ঠীর সঙ্গে অনুপ্রবেশকারীরা ক্রমশ মিশে যাচ্ছে। তিনি এও বলেন যে, এতে সহায়তা করছে সেই রাজ্যের প্রধান দল। অনুপ্রবেশকারীরা শুধু রেশন কার্ডই পাচ্ছে না। তাদের রাজ্যসভার সদস্যও করা হচ্ছে।

রন্তিদেব সেনগুপ্ত তাঁর বক্তব্যে উদ্যোক্তাদের কাছে আহ্বান জানান, শুধু 'দিবস পালনে'ই এই মহান উদ্দেশ্য যেন সীমাবদ্ধ না থাকে। তিনি এও বলেন যে, বামেরা এতদিন শ্যামাপ্রসাদের কাজের সংকীর্ণ ব্যাখ্যা করেছে। তাই হিন্দুর আজ পরিচিতি-সঙ্কট। তাঁর বক্তব্য : 'আজ বাংলাদেশ জুড়ে 'এথনিক ক্লিনসিং' চলছে। শ্যামাপ্রসাদের দূরদৃষ্টির জন্যেই পশ্চিমবঙ্গ রক্ষা পেয়েছে। নিজেকে 'হিন্দু' হিসেবে ঘোষণা করাটা লজ্জার নয়। বরং স্বজাতি যেখানে বিপন্ন সেখানে সেকুলারিজমের বুলি আওড়ানোটাই লজ্জার।' তিনি এমনও বলেন যে পশ্চিমবঙ্গ মৌলবাদের স্থান হতে পারে না। কারণ এই রাজ্য মুক্ত চিন্তার স্থান। আর এই মুক্ত চিন্তা হিন্দুদের থেকেই এসেছে, মুসলমানদের থেকে নয়।

এষা দে বলেন, বাইরের জগতে বাঙালির পরিচয় পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয়েই প্রতিফলিত। তাঁর অভিযোগ, এমন একটি 'প্রোপাগাণ্ডা' ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা চলছে যে বাঙালির একমাত্র অস্তিত্ব যেন বাংলাদেশেই, কারণ তাদের রাষ্ট্রভাষা বাংলা ইত্যাদি। এষাদেবীর বক্তব্য : 'এখানে আমরা চিরদিন পড়ে এসেছি অ— অজগর আসছে তেড়ে, আ— আমটি খাব পেড়ে। আর ওদেশে এখন শেখানো হচ্ছে, অ— অজু করে মসজিদে যাই, আ— আজান দেয় মোয়াজ্জেম ভাই। এই যাদের ভাষা তারা কখনও বাঙালি হতে পারে?'

রাজ্য বিজেপি-র ‘বাংলা বাঁচাও’ অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ গত ২৩ জুন ভারত কেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আত্মবলিদান দিবসে ভারতীয় জনতা পার্টি ‘বাংলা বাঁচাও’ পক্ষ উপলক্ষে কলকাতায় কলেজ স্কোয়ার থেকে রানী রাসমণি রোড পর্যন্ত এক বিশাল মিছিল করে। মিছিল এতটাই দীর্ঘ ছিল যে মিছিলের অগ্রভাগ যখন রানী রাসমণি রোডে পৌঁছে গেছে শেষ ভাগ তখনও কলেজ স্কোয়ারে রয়েছে। রাসমণি রোডের সভায় বিজেপি-র দুই সাংসদ সুরিন্দর সিং আলুওয়ালিয়া, বাবুল সুপ্রিয়, রাজ্য সভাপতি রাহুল সিনহা, রাজ্যের পর্যবেক্ষক সিদ্ধার্থনাথ সিং, প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্য নেতা অধ্যাপক তথাগত রায় প্রমুখ বক্তৃতা দেন।

বক্তারা সকলেই বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের উপর শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের অত্যাচারের তীব্র নিন্দা করে সতর্কবার্তা উচ্চারণ করেন। পশ্চিমবঙ্গকে তৃণমূলী দুষ্কৃতীদের হাত থেকে ‘বাংলা বাঁচাও’-এর ডাক দেন।

ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের সম্মেলনে তৃণমূলের তাণ্ডব

সংবাদদাতা ॥ ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের কার্যক্রম চলাকালীন অতর্কিতে হামলা চালাল তৃণমূলী মদতপুষ্ট একদল দুষ্কৃতী। গত ১৫ জুন রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে গোঘাটের ভাদুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চাতরা গ্রামে। ফলে এই ঘটনায় এলাকায় এক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। জানা যায়, বিগত ইউপিএ সরকারের ভ্রান্ত কৃষিনীতির ফলে যে হারে সারের দাম, বীজের দাম, মজুরি খরচ বেড়েছে তাতে কৃষকদের অবস্থা দিশাহারা। পুনরায় যাতে কৃষকদের সেই অবস্থা না হয় বা পারিপার্শ্বিক খরচ বৃদ্ধির সঙ্গে কৃষকও যাতে ফসলের ন্যায্য মূল্য পায় সেই কথাই নতুন সরকারের দৃষ্টিগোচরে আনার জন্য ছিল এই সম্মেলন। কিন্তু অনুষ্ঠান চলাকালীন দুপুর ১২টা নাগাদ একদল দুষ্কৃতী হামলা চালায় কিষাণ সঙ্ঘের সম্মেলনে উপস্থিত সদস্যদের উপর। সেই সঙ্গে চলে ভাঙচুরও। এদিনের সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রণজিৎ ঘোষ, শঙ্কর ঘোষ এবং সংগঠন সম্পাদক অনিল চন্দ্র রায়-সহ কিষাণ সঙ্ঘের জেলার পদাধিকারীরাও। হুগলী জেলার সম্পাদক উৎপল কুণ্ডু বলেন, রামকৃষ্ণ পোড়েল নামে এক কার্যকর্তার ব্যক্তিগত নার্সারিতে এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠান চলাকালীন কয়েকজন দুষ্কৃতী এসে সম্মেলন বন্ধ করে দিতে বলে। সেই সঙ্গে অবাধে লুঠপাট, টেবিল চেয়ার ভাঙচুর, পতাকা-ফেস্টুন ছিঁড়ে ফেলা এবং বইপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়ে কার্যক্রম লণ্ডভণ্ড করে দেয় তারা। মাঝপথে বন্ধ হয়ে যাওয়া সভার প্রধান উদ্দেশ্য সম্পর্কে শঙ্করবাবু সাংবাদিকদের জানান, কৃষিতে যে খরচ বেড়েছে সে তুলনায় দাম বাড়েনি। তাই সংগঠনের দাবি ধানের কুইন্টাল প্রতি দাম ২৪০০ টাকা করতে হবে। সেই সঙ্গে জৈব সার ও জৈব কীটনাশক তৈরির প্রশিক্ষণও আগামী দিনে দেওয়া হবে।

কিষাণ সঙ্ঘের উদ্দেশ্য যখন চাষের জমিতে কৃষককে লাভের মুখ দেখানো সেখানে যে সরকার মা-মাটি-মানুষকে সামনে রেখে চলে তারাই আবার কৃষক মারতে তৎপর। তা না হলে এই সম্মেলন ভণ্ডুল করতে কেন যাবে তৃণমূল মদতপুষ্ট দুষ্কৃতীরা? আসলে এমনই নানান প্রশ্নের মুখে পড়েছে বর্তমান সরকার। তবে সেদিনের এই ঘটনায় পুলিশের পক্ষ থেকে এখনও কোনো সদর্থক ভূমিকা নিতে দেখা যায়নি। এবং এই ঘটনার অভিযুক্ত কাউকে গ্রেপ্তারও করেনি পুলিশ। তবে কিষাণ সঙ্ঘের এক সদস্যের কথায়, তৃণমূল মদতপুষ্ট দুষ্কৃতীদের চোখরাঙানিকে উপেক্ষা করে আবারও এমন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। যেখানে কৃষকের স্বার্থ জড়িয়ে আছে সেখানেই ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘ সদাসর্বদা তৎপর থাকবে।

বিদেশী ব্যাঙ্কে গচ্ছিত কালোটাকার উৎস সন্ধানে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি

নিজস্ব প্রতিনিধি।। কালো টাকার মালিকদের নাম প্রকাশে তীব্র অনীহা প্রকাশ করার অবস্থান থেকে অনেকটাই সরে এসে সুইস ব্যাঙ্কগুলির কর্তৃপক্ষ ভারতের সঙ্গে তথ্য আদান প্রদান করতে রাজি হয়েছে। প্রসঙ্গত দেশে মোদী সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পক্ষকালের মধ্যেই যে গুরুত্ব দিয়ে কালোধন উদ্ধারে ‘সিট’ স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম) গঠন করেছে তাকে এই বিদেশী ব্যাঙ্কগুলি ভারতের এ সংক্রান্ত সদিচ্ছা ও এককাট্টা মনোভাবেরই ইঙ্গিত বলে মনে করছে। বাস্তবে ক্ষমতায় আসার পর কালোটাকা উদ্ধারে তদন্ত কমিটি ‘সিট’ গঠন করা ছিল এই সরকারের প্রথম প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত।

ওয়াকিবহাল মহল অনুযায়ী সুইস সরকার ইতিমধ্যেই যে দেশের ব্যাঙ্কগুলিতে গচ্ছিত টাকার ভারতীয় মালিকদের নাম প্রস্তুত করেছে। এই প্রসঙ্গে দেশের অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি সুইস সরকারের এই তৎপরতার প্রশংসা করে বলেন, এর ফলে নব গঠিত ‘সিট’ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়ার অধিকারী হবে। জেটলি বলেন, সরকার এই সংক্রান্ত তথ্য সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রকাশ করবে। সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে শ্রী জেটলি বলেন, অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হলো তিনি নিজে এখনও সুইস কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কোনো ব্যক্তিগত কথাবার্তা বলেননি। এই সূত্রে অর্থ দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের বয়ান অনুযায়ী এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে সুইস কর্তৃপক্ষ অনেকটাই একতরফাভাবে তাদের সদিচ্ছা ব্যক্ত করেছে।

জুরিখ থেকে পাওয়া তথ্যসূত্র অনুযায়ী সে দেশের সরকার ভারতের নব নিযুক্ত সরকারকে হিসাব বহির্ভুত ও কর বহির্ভুত কালোটাকা উদ্ধারে সব রকম সহযোগিতা করবে। শুধু তাই নয়, যে সমস্ত ক্ষেত্রে কালোটাকার অ্যাকাউন্টের প্রয়োজনীয় তথ্য ও নথির খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না সে ক্ষেত্রেও সুইস সরকার সব রকম প্রশাসনিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে। এই সূত্রে গত তিন বছরের মধ্যে ঘটে যাওয়া যে-কোনো কর ঘটিত অপরাধকে সর্বশক্তি দিয়ে চিহ্নিত করার ওপর তাঁরা জোর দেন। এদিকে এই সুইস বরফ গলার তারিফ করে সরকারি মহল প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেছে— এর ফলে অপরাধীদের সাজা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশের সম্পদ দেশে ফেরার উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ‘সিট’-এর উপাধ্যক্ষ শ্রী অরিজিৎ পাশাওয়াত বলেন, তালিকাটি সরকারের মাধ্যমে তাঁদের হাতে এলেই এটির ব্যাপক স্ক্রুটিনি শুরু হবে। তিনি আরও বলেন, সুইস সরকারের ঘোষিত ভবিষ্যৎ কার্যক্রম যদি বাস্তবায়িত হয় সে ক্ষেত্রে তাঁদের (সিট) কাজে ব্যাপক অগ্রগতির সম্ভাবনা। প্রসঙ্গত দীর্ঘদিন ধরে জনমনে গেঁথে থাকা কালো টাকা পুনরুদ্ধারে সুইস সরকারের অসহযোগিতার বিষয়টি এবার অমূলক হয়ে পড়বে। অর্থমন্ত্রক সূত্রে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা গেছে— এ যাবৎ চোরাগোপ্তা খবর বাইরে আসার ভিত্তিতেই কালোটাকার মালিকদের নাম ধাম খোঁজার চেষ্টা হোত। এই প্রথম সুইস সরকার সম্পূর্ণ সরকারি সমর্থনে তথ্য সরবরাহ করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। আগের খবরগুলি সবই ভিন্ন ভিন্ন দেশ থেকে লিক হয়ে আসত। তাৎপর্যপূর্ণভাবে সুইস ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী কালো টাকা পাচারকারীরা মূলত ট্রাস্ট, ঘরোয়া প্রাইভেট কোম্পানি বা অন্য কোনো যৌথ আইনসিদ্ধ পরিচয়ে টাকাটা গচ্ছিত করত। এবারে সুইস কর্তারা একেবারে এদের প্রকৃত মালিকদের নাম উদ্ধারের চেষ্টায় রয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে সুইস ব্যাঙ্কগুলি থেকে পাওয়া সংখ্যাতথ্য অনুযায়ী (সুইস ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক) গত ২০১৩ সালে আগের বছরের তুলনায় ৪৩ শতাংশ বেশি কালোটাকা জমা হয়েছে যা ২.০৩ বিলিয়ন সুইস ফ্রাঁ বা ভারতীয় টাকায় ১৪ হাজার কোটী টাকা। তবে সুইস কর্তৃপক্ষের ঘোষিত হিসেব অনুযায়ী সে দেশে ভারতীয় বেআইনি টাকা কয়েক ট্রিলিয়ন ডলার মোটেই নেই। মোট ২৮৩টি সুইস ব্যাঙ্কে ছড়িয়ে থাকা সব দেশ মিলিয়ে মোট কালো টাকার পরিমাণ ১.৬ ট্রিলিয়ন ডলার।

তবে এর মধ্যে ভারতের অংশ হিসেবে একাধিক অনুমান রয়েছে যার ভিত্তিতে মোটামুটি এটি ৫০০—১৪০০ বিলিয়ন ডলারের মধ্যেই ঘোরাফেরা করছে। এর গরিষ্ঠাংশ ফিরলেই যে দেশের জিডিপি-তে স্বাস্থ্যকর পরিবর্তন দেখা দেবে তা তথ্যাভিজ্ঞ মহলের গুঞ্জন।

জ্ঞানসমৃদ্ধ অর্থনীতির অনুসারী হবে শিক্ষানীতি : স্মৃতি ইরানি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ষোড়শ লোকসভা ভোটে বিজেপি-র ঐতিহাসিক জয়ের পর কংগ্রেসের মধ্যে যে অতলান্ত হতাশা দেখা দেয় তারাই পরিণতিতে দেশের নবীন মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রীমতী স্মৃতি ইরানির শিক্ষাগত যোগ্যতা ও মন্ত্রী হিসেবে সম্ভাব্য পারদর্শিতার ওপর তারা চূড়ান্ত ব্যক্তি-আক্রমণ করে। বিজেপি-র তরফে উমা ভারতী জোরালো প্রতি-আক্রমণে যাওয়ার পরই তাদের এই আক্রোশ কিছুটা থিতিয়ে এসেছে। তবে এই শিষ্টাচার বহির্ভূত কর্মে দেশের মানুষের মধ্যে কিঞ্চিৎ হলেও তারা কৌতূহলের সৃষ্টি করতে যে পেরেছিল এটা ঠিক। এই পরিপ্রেক্ষিতেই একটি অগ্রণী ইংরেজি দৈনিকে শ্রীমতী ইরানি দেশের মানবসম্পদ উন্নয়ন (এইচ আর ডি) মন্ত্রী হিসেবে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎকারটি দেন। এই সাক্ষাৎকারে দেশ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর ভাবনার রূপরেখা উঠে এসেছে।

প্রথমেই তাঁর দপ্তরের অগ্রাধিকার কি হবে সে প্রসঙ্গে তিনি বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী দেশের তরুণ তরুণীদের মধ্যে যথাযোগ্য জীবিকা অর্জনের ওপর যে জোর দিয়েছেন সেই সূত্রেই শিক্ষা যাতে যথেষ্ট দক্ষতা বৃদ্ধির সহায়ক হয়, পক্ষান্তরে যা তাদের রোজগারের পথ সুগম করবে এরকম চিন্তা ভাবনাই মন্ত্রকের নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে। অপরপক্ষে রাষ্ট্রপতি দেশের অগ্রণী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বিশেষ করে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মান উন্নয়নের কথা বলেছেন। সেগুলিও যথার্থ মর্যাদায় বিবেচিত হবে। শ্রীমতী ইরানি জানান, অঙ্ক ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জোর দেওয়াই তাঁর নীতির প্রাথমিকতা।

দেশের সব রাজ্যে আই আই টি (ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজি) তৈরি করার যে প্রয়োজনীয়তার কথা

উল্লেখিত হয়েছে সে প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য— ইতিমধ্যেই আই আই টি ডাইরেক্টরদের নিজেদের মধ্যে বসে সাম্প্রতিক চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা ও পঠনপাঠনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংস্কার জরুরি কিনা তা নিয়ে মত বিনিময় করার অনুরোধ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি আই আই টি গুলির প্রাক্তনীদের বর্তমান পড়ুয়াদের উপযুক্ত পরামর্শ দিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে নতুন দিক নির্দেশ দেওয়ার ওপর জোর দেন।

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাবে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, এটা সর্বজনবিদিত যে আমাদের দেশের আই আই টি-গুলি শুধু ইঞ্জিনীয়ার তৈরি করে, গবেষণা সম্পূর্ণ অবহেলিত। এ বিষয়ে শ্রীমতী ইরানি বলেন, ইতিমধ্যেই এইচ আর ডি-র ওয়েব সাইটগুলিতে গবেষণার নানান বিষয়— গ্রান্ট, ফেলোশিপ ও সেই সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করা শুরু হয়েছে। স্কলারশিপ যাতে যথেষ্ট আকর্ষক ও গবেষণার ক্ষেত্র যাতে যথাযথ শিল্প উপযোগী হয় সেগুলিই অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিচার করা হচ্ছে। গবেষণাপত্রগুলি যাতে বিশ্বের নামী পত্রপত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত হয়ে দেশীয় Patent নিতে পারে তাও দেখা হবে।

হিমালয় চর্চার ওপর এত গুরুত্ব কেন দেওয়া হচ্ছে সেই প্রসঙ্গে শ্রীমতী ইরানি তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যমূলক চিন্তার অংশ হিসেবে বলেন যে, তিনি একটি আন্তর্জাতিক মানের সংস্থা করতে চান। যেখানে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, পরিবেশ শুধু নয়, ভূ-বিদ্যা, প্রত্নতত্ত্বের পাশাপাশি জাতিগত সংস্কৃতিরও পূর্ণ চর্চা ও বিকাশ হতে পারে। এই সংস্থা নির্মাণের ক্ষেত্রে শুধু ভারত নয়, বিশ্বের নানান দেশের হিমালয়প্রেমী মানুষই উৎসাহী। ফলে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা পাওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। এর জন্যে বিদেশ দপ্তরের সঙ্গেই উদ্যোগ নিতে হবে। প্রসঙ্গত, শিক্ষার অধিকার, মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান ও রাষ্ট্রীয় উচ্চতর শিক্ষা অভিযানের মতো প্রকল্পগুলি নিয়ে তিনি কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে ব্যাপক মত বিনিময় ও সহযোগিতা চান।

শিক্ষা-সংস্কৃতি ক্ষেত্রের আরও নানান বিষয়ের সঙ্গে সরাসরি দেশের পাঠ্যক্রম বদলানোর ক্ষেত্রে তাঁর ভাবনা চিন্তার প্রসঙ্গে বলেন যে, শেষবার শিক্ষানীতি গৃহীত হয়েছিল ১৯৮৬ সালে। এই ২০১৪ সালের ভারত সম্পূর্ণ আলাদা। আজকের দিনে নতুন ভাবনা নতুন আশা। তাই সমস্ত রাজ্যগুলির ধ্যান-ধারণা, দেশের বিশাল আমলা শ্রেণীর অভিজ্ঞতা ছাড়াও বিশ্বের শিক্ষাক্ষেত্রের যাঁরা দিকপাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা সংস্কারে নির্দিষ্ট অভিজ্ঞতা ও ফলাফল সম্পর্কে ওয়াকিবহাল তাঁদের মতামত জরুরি। নতুন কোনো উদ্ভাবনা কেউ দিতে পারলে তাও স্বাগত জানানো হবে। আজকের শুধু নয় আগামী দশকের প্রয়োজন ও বিশ্ব মানচিত্রে জায়গা করে নিতে গেলে যে জ্ঞান-সমৃদ্ধ অর্থনীতির দরকার তারই অনুসারী হবে শিক্ষানীতি। এরপর যে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বহু চর্চিত প্রশ্নটি ছুঁড়ে দেওয়া হয় অর্থাৎ সিলেবাসের কি গেরুয়াকরণ হবে? স্বভাবসুলভ সপ্রতিভায় শ্রীমতী ইরানি জানান— রাষ্ট্রপতির বক্তৃতায় ও প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশে যা প্রকাশ পেয়েছে সেগুলিই তাঁর দপ্তরের ঘোষিতনীতি। তাঁর মধ্যে এই অবান্তর বিষয়গুলি আছে কি? স্মৃতি ইরানি সম্পর্কিত ভ্রান্তির প্রাচীর ভাঙতে সাক্ষাৎকারের এই ঝলকগুলিই পর্যাপ্ত বলে মনে হয়।

পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রতিককালের রাজনৈতিক দাঙ্গার চরিত্রটি পুরোপুরি সাম্প্রদায়িক

লোকসভার নির্বাচনের সময় থেকেই এই রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস আশ্রিত সমাজবিরোধীরা দাঙ্গা হাঙ্গামা খুনের রাজনীতি চালু করে দিয়েছে। খবরের কাগজের প্রতিবেদনে লেখা হচ্ছে যে তৃণমূলের আদি ও নব এই দুই গোষ্ঠীর ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ের পরিণতিতে সংঘর্ষ হচ্ছে। কথাটা পুরোপুরি সত্য নয়। আংশিক সত্য। আসল কথাটি হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রতিককালের রাজনৈতিক দাঙ্গার চরিত্রটি পুরোপুরি সাম্প্রদায়িক। 'নব' নামে তৃণমূলের যে গোষ্ঠীর কথা সংবাদমাধ্যমে বলা হচ্ছে তা আদতে সিপিএমের ছত্রছায়া থেকে চলে আসা মুসলমান সম্প্রদায়ের সমাজবিরোধীদের একাংশ। এরা বাম জমানায় দাঙ্গা হাঙ্গামা, খুন, অপহরণ, তোলাবাজিতে হাত পাকিয়ে ছিল। গত ২০১১ সালে রাজ্যে ক্ষমতার পালা বদলের পর এরাই সুযোগ বুঝে লাল ঝাণ্ডা ফেলে ঘাস ফুলের আশ্রয়ে এসেছে। এই দুষ্ট সাম্প্রদায়িক চক্রটি নানা ছলছুতোয় বেছে বেছে তৃণমূলের হিন্দু গোষ্ঠী নেতাদের এবং বিজেপির হিন্দু সমর্থকদের উপর প্রাণঘাতি হামলা চালাচ্ছে। সাম্প্রতিককালের কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করলে হামলার সাম্প্রদায়িক চরিত্রটি বোঝা সহজ হবে। উত্তর চব্বিশ পরগণার বসিরহাট মহকুমার সন্দেশখালিতে বিজেপির সমর্থকরা নরেন্দ্র মোদীর প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ গ্রহণ উপলক্ষে একটি বিজয় মিছিল বের করেন। এই মিছিলের উপর বোমা বন্দুক নিয়ে তৃণমূল আশ্রিত একদল মুসলমান গুণ্ডা বেপরোয়া আক্রমণ চালায়। কমপক্ষে ২৬ জন বিজেপি সমর্থক গুরুতর আহত হন। ঘটনার গুরুত্ব বুঝে বিজেপি সাংসদ মীনাক্ষি লেখির নেতৃত্বে একটি কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল সন্দেশখালি সফর করেন। সেখানে হালদারপাড়া এবং গায়েনপাড়ার আক্রান্ত হিন্দু পরিবাররা কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদের জানান যে মুসলমান সমাজবিরোধীরা তৃণমূলের পতাকা হাতে তাঁদের প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছে। সন্দেশখালির দাঙ্গার সঙ্গে সুদূর দক্ষিণ ভারতের কর্নাটকের বিজাপুরে ঘটে যাওয়া সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার যথেষ্ট মিল আছে। বিজেপির নির্বাচনী সাফল্যে উৎসাহিত সেখানের হিন্দু সমর্থকরা বিজয় মিছিল বের করলে মুসলমান দুষ্কৃতীরা হামলা চালায়। কর্নাটক সরকার বিজাপুরের ঘটনাকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বলে ঘোষণা করতে বিচলিত হয়নি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার সন্দেশখালির দাঙ্গাকে সাম্প্রদায়িক বলেনি। এমনকী

গূঢ়পুরুষের কলম

বিজেপির কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিরাও এই হামলার সাম্প্রদায়িক চরিত্রটি উল্লেখ করেননি। হয়তো রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার জন্য অনেক সময় শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে হয়।

আনন্দবাজার পত্রিকার ২২ জুন রবিবার চারের পাতায় একটি প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে, ''এখন যা শুরু হয়েছে তা' মহাভারতের মুষলপর্বের মতো।'' অর্থাৎ তৃণমূলই তৃণমূলকে বিনাশ করবে। মহাভারতের মহাযুদ্ধের পর মুষল পর্বে এভাবেই শ্রীকৃষ্ণের যদুবংশ ধ্বংস হয়। তৃণমূল দলের মধ্যে মুষল পর্বে এখন আদি গোষ্ঠীর হিন্দু নেতাদের উপর নব গোষ্ঠীর মুসলমান নেতা সমর্থকরা হামলা চালাচ্ছে। লোকসভা ভোটের পর তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষে প্রাণহানি ঘটেছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার রায়দিঘিতে, উত্তর চব্বিশ পরগণার পানিহাটিতে। সংঘর্ষ হয়েছে বীরভূম, হুগলী, দুই মেদিনীপুর, বর্ধমান এমনকী কলকাতার পূর্ব শহরতলি নিউটাউন-রাজারহাটে। ব্যারাকপুরে তৃণমূলের আইনজীবী নেতা রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য নিজের চেম্বারে গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর সেখানে আদি গোষ্ঠীর হিন্দু তৃণমূল নেতারা আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন। তৃণমূল নেতৃত্ব অবশ্য তাঁদের অন্তর্দলীয় সংঘর্ষের পিছনে বিজেপি-র ভূত দেখছেন। ভদ্রেশ্বরে চটকলের ভিতরে অফিসার খুনের পিছনেও বিজেপির ছায়া দেখতে পেয়েছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অথচ একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর উক্তি, 'আরশোলা বিজেপির এখন পাখি হয়ে ওড়ার শখ হয়েছে। এই রাজ্যে বিজেপি-র কোনও রাজনৈতিক শক্তিই নেই।' যদি রাজ্য বিজেপি-র রাজনৈতিক শক্তি নাই থাকে তবে তারা শাসকদলের নেতা সমর্থকদের উপরে দিনের পর দিন আক্রমণ চালাবে কীভাবে? মুখ্যমন্ত্রীর উক্তি স্ববিরোধী নয় কি? সম্প্রতি হুগলী জেলার আরামবাগে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে তৃণমূল নেতা নরেশ রায় খুন হন। আহত হন নরেশবাবুর সমর্থক ১২ জন তৃণমূল কর্মী। মৃত নরেশ রায় এবং আহতরা সকলেই শাসকদলের আদি গোষ্ঠীর হিন্দু কর্মী। আক্রমণকারীরা ছিল নব গোষ্ঠীর নেতা শাহাবুদ্দিনের সশস্ত্র মুসলিম সমর্থক। এই ঘটনার পর পুলিশ যে ৩৬ জন তৃণমূল সমর্থককে গ্রেপ্তার করেছে তাদের অধিকাংশই মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ। আরামবাগের শান্তিপ্রিয় মানুষ জানেন সেখানে শাসকদলের গোষ্ঠীনেতা তপন মণ্ডল— নিতাই নন্দীদের সঙ্গে ক্ষমতা দখলের লড়াই চলেছে নবাগত গোষ্ঠীনেতা আতাউল হক— শাহাবুদ্দিনদের। নিহত নরেশ রায় ছিলেন নিতাই নন্দীর অনুগামী। বীরভূমের কাঁকরতলা এলাকায় তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর লড়াইতেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সব লক্ষণই আছে। এখানে ক্ষমতা দখলের লড়াই চলছে স্থানীয় পঞ্চায়েত নেতা নিরঞ্জন মণ্ডলের গোষ্ঠীর সঙ্গে তৃণমূলের শেখ হাঁদুর গোষ্ঠীর। তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষের চরিত্রটি সাম্প্রদায়িক তা অজানা নয় শাসকদলের নেতৃত্বের। তাই তাঁরা চেষ্টা করছেন হামলার অভিমুখ বিজেপির দিকে ঘুরিয়ে দিতে। তবে তাতে আখেরে রাজনৈতিক লাভ হবে না শাসকদলের। বরং দলে দলে তৃণমূলের হিন্দু সমর্থকরাই যোগ দেবেন বিজেপিতে। যেমন, এখন বামদলের সমর্থকরা তৃণমূলের হামলা থেকে বাঁচতে যোগ দিচ্ছেন বিজেপিতে।

নবান্নে কুচকাওয়াজ লেফট রাইট লেফট রাইট

মাননীয় বিমান বসু
বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান
৩৩, আলিমুদ্দিন স্ট্রিট, কলকাতা

কমরেড, কলকাতার ফিশফ্রাইয়ে কি টেস্ট কম পড়িয়াছে? আর হাওড়ার ফিশফ্রাইয়ের মাছ কি বেশি সুস্বাদু? না রাগ করবেন না প্লিজ। আসলে নবান্ন থেকে বের হওয়ার সময় আপনার মুখটি যেমন আহ্লাদিত লাগছিল তাতে মনে হচ্ছিল আপনি যেন বলতে চাইছেন, আহা কি কফি, কি ফিশফ্রাই, কি ক্রিমরোল খাইলাম রে বাবা, জন্মজন্মান্তরেও এমন স্বাদ পাই নাই। না, একথা আমি বলছি না, বলছে আপনার ক্যাডাররা। এই দুর্দিনেও যাঁরা আপনাদের ভোট দিয়েছেন তাঁরা। আমি বলছি না কারণ, আমি জানি, কমরেডদের শৃঙ্খল ছাড়া হারাবার কিছু নেই। জয় করার জন্য আছে গোটা বিশ্ব। আর সেই বিশ্বের অঙ্গ ক্রিমরোল, ফিশ ফ্রাই। মুখ্যমন্ত্রীর আতিথেয়তা মেশানো ওই ক্রিমরোল, বাদশা শাহরুখ পছন্দের ওই ফিশ ফ্রাইয়ের কাছে সর্বহারাও হার মানে।

যাই হোক, আপনারা খেয়েছেন বলে কোনও দোষের নয়। কিন্তু সেই খাবার যে হজম হয়ে গেছে এটা বিস্ময়ের। আপনার দল বেঁধে বামফ্রন্টের নেতারা গিয়েছিলেন, গ্রামে গ্রামে আপনাদের কর্মী, সমর্থকদের দুর্দশার প্রতিবাদ করতে। শাসক দলের নির্যাতনের ভয়ে তাঁর অনেকেই ঘর ছাড়া, অনেকের ধোপা-নাপিত বন্ধ। ঘর না থাকা আর এক ঘরে হয়ে থাকার ক্ষেত্রে একটা বড় মিল হলো, দু'দলই খেতে পায় না। কিন্তু তাবলে বলছি না, আলিমুদ্দিনের সব নেতা দাঁতে কিচ্ছুটি কাটবেন না। কাটুন। পেট ভরেই খাওয়া দাওয়া করুন। কিন্তু যে বা যাদের বিরুদ্ধে কর্মী, সমর্থকদের ওপর নির্যাতন চালানোর অভিযোগ আপনাদের তাঁদের আতিথেয়তায় এমন আপ্লুত হওয়া দেখে সত্যিই প্রশ্ন জাগে। প্রতিবাদ জানানোর জন্য যেভাবে সেই শক্ত পেশি শিথিল হয়ে গেল তা দেখে যে কারও মনে প্রশ্ন জাগবে। তবে আপনারা যে নেমকহারাম নন সেটা কিন্তু আপনাদের নুন খেয়ে গুণ গাওয়া দেখেই স্পষ্ট হয়ে গেছে।

সূর্যকান্ত মিশ্র সেদিন যাননি। শোনা যাচ্ছে বিপ্লবের দিন চূড়ান্ত করতে দিল্লী গিয়েছিলেন। ইয়েচুরি কারাতদের সঙ্গে বৈঠক-টেঠক কিছু একটা করছিলেন। তবে ফিশফ্রাই, ক্রিমরোল, সন্দেশ খেতে না পেয়ে তিনি যে খুব একটা হতাশ এমনটা শোনা যায়নি। তিনি খুব একটা পেটুক নন বলেই জানা। তাছাড়া ডাক্তার মানুষ হিসেবে ভালই জানেন যে এই অসময়ে বা দুঃসময়ে বেশি ভাজাভুজি পেটে সয় না। তবে আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ চোঁয়া ঢেকুর ওঠায় ওঁর থেকে নাকি ওষুধ চেয়ে খেয়েছেন বলে বাজারে খবর। আচ্ছা, বিমানবাবু একটি বার জানাবেন আপনাদের সেই সব ঘরছাড়া, গ্রামছাড়া হতভাগ্য কমরেডরা কি নিজেদের ঠিকানায় ফিরতে পেরেছেন? শোনা যাচ্ছে নবান্নে জলযোগে আপনাদের এমন হাঁসফাঁস অবস্থা হয়েছিল যে আপনারা নাকি ঠিক করে দাবি দাওয়া জানাতেই পারেননি। যদিও সেটা আমি বিশ্বাস করি না। কারণ, দফা দফা দাবি দাওয়া পেশ করায় বাংলার বামপন্থীদের কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। একই সঙ্গে সেই দাবি পূরণ করা হলো কিনা তা নিয়েও খুব একটা উদ্বেগ নেই। বরং কোনও দাবি মিটে যাওয়া মানে পরের বার একটা দাবি কমে যাওয়া। একটা দাবি কমে যাওয়া মানে প্রতিবাদ ফিকে হয়ে যাওয়া।

আমি বরং একটা বুদ্ধি দিই। এবার আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে একটা পাল্টা খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করুন। কমিউনিজমের লোক দেখানো চা-মুড়ি নয়, মেনুতে রাখুন রাশিয়ান ডিশ। না, তার দরকার নেই মোগলাই খানাই ভাল হবে। বিভিন্ন জেলা কমিটি, লোকাল কমিটিকে বলুন লোকাল স্পেশাল মিষ্টি পাঠাতে। অনেকদিন আপনাদের কোনও আন্দোলন টান্দোলন নেই, ফলে একটা কাজ পাবে নেতারা। সরকারকে পাল্টা দাওয়াতের কর্মসূচি। পার্টি অফিসে আসতে না চাইলে কাছাকাছির মধ্যে মৌলালি যুবকেন্দ্র কিংবা কোনও বিয়েবাড়ি ভাড়া নিয়ে নিন। সেদিন বরং শাসকেরা যখন দাঁত খুঁচতে খুঁচতে বের হবেন তখন আবেদন করুন। প্লিজ ঘরছাড়াদের ফিরিয়ে দিন না প্লিজ। গলাটা আবেগে ভিজিয়ে নেবেন, কাজ হতে পারে।

বুদ্ধদেববাবুকে থাকতে বলবেন, সুশান্ত ঘোষও যেন থাকেন। সঙ্গে অতিথি করে আনুন লক্ষ্মণ শেঠ, রেজ্জাক মোল্লা আর অবশ্যই অনিল বসুকে। মানে আপনাদের বর্তমান এবং প্রাক্তন ঘরছাড়া করা এবং ঘরে ফেরানোয় এক্সপার্টদের হাজির রাখুন। আপনাদের যোগ্য ছাত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে না হয় তাঁরাই শিখিয়ে দেবেন কীভাবে বাম কর্মী সমর্থকদের ঠিকানায় ফেরানো যায়।

শেষে বিজেপি কর্মীদের তাড়ানোর কায়দাটা শেখাতে ভুলবেন না যেন। আর হ্যাঁ, খাওয়া দাওয়ার শেষে একটু পানের ব্যবস্থা রাখবেন। না, না ওই পান নয়। পা-ন, পা-ন। মিষ্টি পান।

— সুন্দর মৌলিক

উত্তর সম্পাদকীয়

প্রসঙ্গ ৩৭০ নং অনুচ্ছেদ

ড. নির্মলেন্দুবিকাশ রক্ষিত

> “সুতরাং কাশ্মীর ভারতের অন্যান্য অঙ্গরাজ্যের সমপর্যায়ভুক্ত। একটা সময় তাকে কিছু বিশেষ সুবিধে ও পৃথক মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল ঐতিহাসিক ও বাস্তব কারণে। কিন্তু সেটা অনন্তকালের জন্য থাকতে পারে না।”

আমাদের সংবিধান অনুসারে জম্মু-কাশ্মীর ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম অঙ্গরাজ্য হলেও তার একটা পৃথক মর্যাদা রয়েছে। তাই সহদেব গুপ্তা মন্তব্য করেছেন, “State of Jammu and Kashmir has a special position in the India federation”--- (দ্য ইন্ডিয়ান কন্‌স্টিটিউশান, পৃ. ২১৬)। অন্যান্য অঙ্গরাজ্যের তুলনায় তার মর্যাদা, ক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধে অনেক বেশি। বলা দরকার— সংবিধানের ৩৭০ নং অনুচ্ছেদ এই ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছে।

ভারতের নতুন সংবিধান যখন প্রবর্তিত হয়, তখন কতগুলো দেশীয় রাজ্যের সঙ্গে জম্মু-কাশ্মীরকেও ‘স্ব’ শ্রেণীভুক্ত রাজ্যে পরিণত করা হয়। কিন্তু এই ধরনের রাজ্যের বেলায় সংবিধানের যেসব ধারা প্রযোজ্য ছিল, সেগুলো কাশ্মীরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়নি। তার জন্য রাখা হয়েছে বিশেষ ব্যবস্থা— সেটা ‘Transitory and Temporary provisions’ অংশে উল্লিখিত হয়েছে।

৩৭০ নং অনুচ্ছেদে আছে—

▯ সংবিধানের ১ নং অনুচ্ছেদ (জম্মু ও কাশ্মীর ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ) ও ৩৭০ নং অনুচ্ছেদই কাশ্মীরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

▯ ওই রাজ্যের ক্ষেত্রে সংসদ বা পার্লামেন্ট কেন্দ্র-তালিকা ও যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত সেই সব বিষয়ের ওপরেই আইন প্রণয়ন করতে পারবে যেগুলো ভারতের সঙ্গে যোগদানের চুক্তিতে (Instrument of Accession) নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

▯ সেই তালিকা দুটোর অন্তর্গত অন্য সেইসব বিষয়ের উপরেই সংসদ আইন করতে পারবে যেগুলো কাশ্মীর-সরকারের সম্মতি নিয়ে রাষ্ট্রপতি ঠিক করে দেবেন নির্দেশ দানের মাধ্যমে।

▯ এই অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা ততদিনই চলবে যতদিন না কাশ্মীর- সরকারের সংবিধান রচনার জন্য আহূত গণপরিষদ এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং তার সুপারিশে রাষ্ট্রপতি ৩৭০ ধারার ব্যবস্থা রহিত করেন।

১৯৫০ সালে রাষ্ট্রপতি প্রথম নির্দেশ দেন ‘The constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 1950’-র মাধ্যমে। এরপর ১৯৫২ সালে ভারত-সরকার ও কাশ্মীর-সরকারের একটা চুক্তি হয়। সেই চুক্তি অনুসারে রাষ্ট্রপতি ১৯৫০ সালে আবার একটা নির্দেশ জারি করেন। পরে অবশ্য এই নির্দেশ কয়েকবার সংশোধিত হয়েছে আর এই ভিত্তিতেই কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কাশ্মীর-সরকারের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। এর দ্বারা সংবিধানের অনেক ব্যবস্থাই বদলে গেছে— (কেদিয়া পাণ্ডে— এসেম্বিয়ান্‌ অফ দ্য ইন্ডিয়ান কন্‌স্টিটিউশান, পৃ. ৪৭)।

এই নির্দেশে আছে—

▯ কাশ্মীরে সম্পত্তির অধিকার থাকবে।

▯ নির্দেশমূলক নীতি ও মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত নিয়মগুলো সেখানে প্রযোজ্য হবে না।

▯ রাজ্যে জরুরি অবস্থা জারি সংক্রান্ত রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা সীমিত হবে। কেন্দ্রের নির্দেশ অমান্য করলে রাষ্ট্রপতি সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারকে ভেঙে দিতে পারেন (৩৬৫ নং অনুচ্ছেদ), কিন্তু এটা কাশ্মীরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

▯ আইন-প্রণয়নের রাজ্য তালিকা কাশ্মীরে নেই।

▯ শান্তির সময়েও সংসদ ২৪৯, ২৫২ ও ২৫৩ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে রাজ্য তালিকায় আইন রচনা করতে পারে। কাশ্মীরের ক্ষেত্রে সেটা কিন্তু সম্ভব নয়।

৩৭০ নং অনুচ্ছেদটা আমাদের সংবিধানের সবচেয়ে বিতর্কিত বিষয়— ড. সুভাষচন্দ্র কাশ্যপের ভাষায় ‘politically perhaps the most controversial’— (আওয়ার কন্‌স্টিটিউশান, পৃ. ২৭৫। জম্মু-কাশ্মীর অবশ্যই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দিয়ে তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়েছে। কিন্তু ৩৭০ নং অনুচ্ছেদ থেকে প্রশ্ন জাগে— সত্যিই কি সেটা ভারতের অঙ্গরাজ্য? ডঃ এস এল সিক্রি লিখেছেন, ‘Jammu and Kashmir's integration with India is a fact, but some keep questions the fact of accession 'itself’— (ইন্ডিয়ান

গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স, পৃ. ২৫৬)।

আসলে কাশ্মীর ভারতের অঙ্গরাজ্য হলেও এটা 'class by itself' তার আলাদা সংবিধান ও মর্যাদা রয়েছে— ভারতীয় সংবিধানের অনেক কিছুই তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। ড. এম এম সিং মন্তব্য করেছেন, 'Jammu and Kashmir enjoys greater autonomus than of the others constituent states'— (দ্য কনস্টিটিউশান অফ ইন্ডিয়া, পৃ. ১০৫৯)।

এটা লক্ষণীয় যে, আমাদের সংসদ কেন্দ্র-তালিকা ও যুগ্মতালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলোর ওপর আইন রচনা করতে পারে। তাছাড়া স্বাভাবিক অবস্থাতেও রাজ্য-তালিকায় অন্তর্গত কোনও বিষয়ে জাতীয় স্বার্থে বা আন্তর্জাতিক চুক্তি বলবৎ করার কারণে বিশেষ পদ্ধতিতে আইন প্রণয়ন করতে পারে— (ড. বি সি রাউত— ডেমোক্র্যাটিক কনস্টিটিউশান অফ ইন্ডিয়া, পৃ. ১৩৯)। কিন্তু কাশ্মীরের ক্ষেত্রে এই ব্যাপারে রয়েছে নানা বিধিনিষেধ। তাছাড়া রাষ্ট্রপতি শাসন জরুরি, মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত ব্যবস্থা, নির্দেশমূলক নীতির রূপায়ণ ইত্যাদি ব্যাপারেও রয়েছে সীমাবদ্ধতা। এমনকী, আগে কাশ্মীরের রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীকে বলা হোত যথাক্রমে 'সদর-ই-রিয়াসত' ও 'প্রধানমন্ত্রী'।

এই সব হয়েছে একটা কারণে। সেই ঐতিহাসিক পটভূমি নিয়ে সামান্য কিছু বলা দরকার।

আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের শেষ পর্বে যখন ক্ষমতা হস্তান্তরের কথাবার্তা চলছে, তখন একটা প্রশ্ন উঠে পড়েছিল। দেশে মোট ৫৬২টা রাজ্য ছিল— সেগুলো ছিল প্রায় স্বাধীন, রাজা ও নবাবরাই সেগুলো শাসন করতেন--- বৃটিশ সরকার এই ব্যাপারে তেমন হস্তক্ষেপ করতো না। প্রশ্ন উঠল— 'বৃটিশ 'প্যারামাউন্টসি' চলে গেলে তাদের অবস্থান কি হবে।'

'ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যাক্ট' জানাল— তারা 'ইনস্ট্রুমেন্ট অফ অ্যাক্সেশন'-এ স্বাক্ষর দিয়ে ভারত বা পাকিস্তান ডোমিনিয়ানে যোগ দিতে পারবে--- ইচ্ছে করলে স্বাধীনও থাকতে পারবে। ব্যাপারটা ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল রাজা/নবাবদের ওপরেই। সেই অনুসারে অধিকাংশ দেশীয় রাজ্য (Princely states) ভারতে এবং কয়েকটা রাজ্য পাকিস্তানে যোগ দিয়েছিল।

কাশ্মীরের রাজা হরি সিং ছিলেন হিন্দু, কিন্তু রাজ্যটা ছিল মুসলমান অধ্যুষিত। রাজার পক্ষে ভারতে যোগদান করার অসুবিধেটা ছিল এই জায়গাতেই। তাছাড়া তিনি চেয়েছিলেন স্বাধীন থাকতে। সেই কারণে তিনি দীর্ঘদিন টালবাহানা করেছেন।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহরু ভেবেছিলেন, কাশ্মীরে গিয়ে রাজার সঙ্গে কথা বলবেন। কিন্তু হরি সিং নেহরুকে পছন্দ করতেন না বলে বড়লাট মাউন্টব্যাটেন নিজেই কাশ্মীরে গিয়েছেন। কিন্তু নির্দিষ্ট দিনে অসুস্থতার অজুহাতে রাজা বৈঠকটা বাতিল করে দিয়েছেন— এমনটা তিনি নাকি করতেন অসুবিধে দেখলেই। লিওনার্ড মস্‌লে লিখেছেন, হতাশ হয়েই বড়লাট ফিরে এসেছেন— 'Needless to say, Mountbatten is very disappointed at this turn of events'— (দ্য লাস্ট্ ডেজ অফ দ্য বৃটিশ রাজ, পৃ. ২১৩)।

তারপরের ঘটনাগুলো ঘটেছে দ্রুত গতিতে।

১৯৪৭ সালের অক্টোবরে পাক্-বাহিনী হঠাৎ কাশ্মীর আক্রমণ করে শ্রীনগরের দিকে এগিয়ে আসছে। আত্মরক্ষার জন্য তখন রাজা হরি সিং ভারতের সাহায্য চেয়েছেন এবং প্রধানমন্ত্রী মেহেরচাঁদ মহাজনকে দিল্লী পাঠিয়েছেন। কিন্তু ভারত-সরকার তাঁকে জানিয়েছিলেন যে, রাজা ভারতের যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দেননি এবং সেই কারণেই ভারত এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। তড়িঘড়ি মহাজন কাশ্মীরে ফিরে গিয়েছেন এবং ইন্‌স্ট্রুমেন্টে রাজার স্বাক্ষর নিয়ে দ্রুত ফিরেছেন। মহারাজা ইন্‌স্ট্রুমেন্টে স্বাক্ষর দিয়ে পৃথক চিঠিতে জানিয়েছেন যে, তিনি আন্তরিকভাবেই ভারতে যোগ দিচ্ছেন। এভাবেই কাশ্মীর হয়েছে ভারতের অঙ্গরাজ্য— (ড. বিদ্যাধর মহাজন — দ্য কন্‌স্টিটিউশান অফ ইন্ডিয়া, পৃ. ৩৪২—৪৩)।

কিন্তু একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে কাশ্মীর ভারতভুক্ত হওয়ায় তাকে একটা বিশেষ মর্যাদা দিতে হয়েছে, রাখতে হয়েছে ৩৭০ নং অনুচ্ছেদ। জি. এস. যোশীর ভাষায়— 'The state of Jammu and Kashmir has been treated in the constitution separately and differently from other states'— (দ্য কনস্টিটিউশান অফ ইন্ডিয়া, পৃ. ৩৭৪)। সম্ভবত, সংবিধান রচয়িতারা রাজার দ্বিধা ও মুসলমান প্রজাদের অবস্থার কথা ভেবে ওই রাজ্যকে দিয়েছেন বিশেষ মর্যাদা।

কিন্তু তারপর কাশ্মীরের গণপরিষদের সৃষ্ট নিজস্ব সংবিধানও কাশ্মীরকে ভারতের অঙ্গরাজ্য ও অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে স্বীকার করেছে। তাছাড়া কেটে গিয়েছে সাতষট্টি বছর। এর পরে এই বিশেষ ব্যবস্থা আর থাকতে পারে না। প্রখ্যাত আইনজ্ঞ জি এস পাণ্ডে মন্তব্য করেছেন, "However, Act 370 is a temporary provision. It was not interdad to be permanent"— (কন্‌স্টিটিউশান ল অফ ইন্ডিয়া, পৃ. ৪৯৯)। সুতরাং এই অনুচ্ছেদ বাতিল করে এবার কাশ্মীরকে অন্যান্য অঙ্গরাজ্যের সমপর্যায়ে আনতেই হবে।

প্রখ্যাত সংবিধান বিশেষজ্ঞ দুর্গাদাস বসু লিখেছেন, কাশ্মীর অন্যান্য দেশীয় রাজ্যের মতোই একটা দলিলে (Instrument) স্বাক্ষর দিয়ে ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে— তার জন্য পৃথক দলিল ছিল না। তাঁর ভাষায়— "...the Instrument of Accession signed by Hari Singh on the 25th October, 1947, was in the some form as was executed by the meters of the unmerous other states which had acceded to India"— (ইন্ট্রোডাকশান টু দ্য কন্‌স্টিটিউশান অফ ইন্ডিয়া, পৃ. ২২৯)। সুতরাং কাশ্মীর ভারতের অন্যান্য অঙ্গরাজ্যের সমপর্যায়ভুক্ত। একটা সময় তাকে কিছু বিশেষ সুবিধে ও পৃথক মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল ঐতিহাসিক ও বাস্তব কারণে। কিন্তু সেটা অনন্তকালের জন্য থাকতে পারে না।

ধারা ৩৭০ সংক্রান্ত কয়েকটি লক্ষণীয় বিষয়

মাধব গোবিন্দ বৈদ্য

 ধারা ৩৭০ আমাদের ভারতীয় সংবিধানের অংশ।

 এই ধারা সংবিধানের XXI অধ্যায়ে রয়েছে। এই অধ্যায়ের শিরোনাম হলো— 'অস্থায়ী, পরিবর্তনীয় ও বিশেষ ব্যবস্থা' ("Temporary provisions with respect to the State of Jammu and Kashmir")।

 ধারা ৩৭০ এর শিরোনাম--- জম্মু-কাশ্মীরের বিষয়ে অস্থায়ী বন্দোবস্ত। (Temporary provisions with respect to the State of Jammu and Kashmir)।

 আমাদের সংবিধান ২৬ জানুয়ারি ১৯৫০ থেকে কার্যকর হয়েছে। ধারা ৩৭০-এ যে সকল শর্ত রয়েছে মাঝে মাঝে তার মধ্যে পরিবর্তন করা হয়েছে। এই ধারার প্রথম সংশোধন ১৯৫৪ সালে হয়েছে। ১৯৫৪ সাল এই জন্য গুরুত্বপূর্ণ যে ১৯৫৩ সালে জম্মু-কাশ্মীরের তৎকালীন উজীর-এ-আজম শেখ মহম্মদ আবদুল্লা, যিনি আমাদের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন, তাঁকে গ্রেপ্তার করে জেলে রাখা হয়েছিল। সেইসময় জম্মু-কাশ্মীর বিধানসভায় এসব সংশোধন গৃহীত হয়েছিল।

 সংশোধিত শর্তাবলী নিম্নরূপ :

(ক) ১৯৫৪ সাল থেকে চুঙ্গি, কেন্দ্রীয় আবগারি, নগর উন্নয়ন, ডাক-তার বিভাগ সম্পর্কিত আইন জম্মু-কাশ্মীরে প্রযোজ্য হবে।

(খ) ১৯৫৮ থেকে কেন্দ্রীয় সরকার আই এ এস এবং আই পি এস অফিসারদের এই রাজ্যে নিযুক্তি শুরু করে। একই সঙ্গে সি এ জি (ক্যাগ)-এর অধিকারের সীমাও এই রাজ্যে বিস্তৃত হয়।

(গ) ১৯৫৯ থেকে কেন্দ্রীয় জনগণনা আইন জম্মু-কাশ্মীরে প্রযোজ্য হয়।

(ঘ) ১৯৬০ থেকে সুপ্রিম কোর্ট জম্মু-কাশ্মীরের হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল গ্রহণ শুরু করে এবং তা বিধিসম্মত করে।

(ঙ) ১৯৬৪ সালে সংবিধানের ৩৫৬ ও ৩৫৭ ধারা এই রাজ্যে প্রয়োগ শুরু হয়। এই অনুচ্ছেদ অনুসারে জম্মু-কাশ্মীরে সাংবিধানিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়লে রাষ্ট্রপতি শাসনের অধিকার প্রয়োগ করা যাবে।

 ১৯৬৫-তে শ্রমিক কল্যাণ, শ্রমিক সংগঠন, সামাজিক সুরক্ষা ও সামাজিক বীমা সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় আইন জম্মু-কাশ্মীরে প্রযোজ্য হবে।

 ১৯৬৬ সাল থেকে লোকসভাতে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত অথবা নিজেদের প্রতিনিধি পাঠানোর অধিকার দেওয়া হয়েছে।

 ১৯৬৬ সালে জম্মু-কাশ্মীর বিধানসভায় সেই রাজ্যের সংবিধানের আবশ্যক সংশোধন করা হয়েছে এবং সেখানে 'প্রধানমন্ত্রী'-র স্থলে 'মুখ্যমন্ত্রী' ও 'সদর-এ রিয়াসত'-এর বদলে 'রাজ্যপাল' শব্দ ব্যবহার স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। আগে 'সদর এ রিয়াসত' বিধানসভা দ্বারা নির্বাচিত হতেন। এখন রাষ্ট্রপতির দ্বারা রাজ্যপাল নিযুক্ত হন।

 ১৯৮৬ সাল থেকে ভারতীয় সংবিধানের ২৪৯-এর শর্তাবলী এখন জম্মু-কাশ্মীরে প্রযোজ্য।

একথা ঠিক যে গত ২৮ বছরে ৩৭০ ধারার কোনো সংশোধন হয়নি। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে তা আর কখনও সংশোধন করা যাবে না। জম্মু-কাশ্মীরের নেতা প্রেমনাথ বজাজ-কে ২১ আগস্ট, ১৯৬২ সালে লেখা পণ্ডিত জহওরলাল নেহরুর এক চিঠিতে এটা স্পষ্ট যে নেহরুও মনে করতেন কোনো না কোনো সময়ে ৩৭০ ধারা-র প্রয়োজন শেষ হয়ে যাবে। নেহরু লিখেছেন--- বাস্তব তো এটাই যে সংবিধানের এই অনুচ্ছেদ যাতে জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যকে বিশেষ অধিকার দেওয়া হয়েছে। এটা হওয়া সত্ত্বেও কিছু অন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে,আরও কিছু করা হচ্ছে বা হবে। একাত্মতার ভাবনাই হলো আসল কথা। এর মধ্যে দ্বিতীয় আর কিছু নেই। কখনও কখনও ভাবনাই মহত্ত্বপূর্ণ হিসাবে প্রমাণিত হয়।

আরও কয়েকটি কথা মনে রাখা দরকার। যেমন—

(১) এই ধারাতেই ধারাটির সম্পূর্ণভাবে বাতিল হওয়ার কথা বলা হয়েছে। ধারা ৩৭০-এর উপ অনুচ্ছেদ ৩-এ বলা হয়েছে— পূর্ববর্তী শর্তাবলীর যা কিছুই লেখা হোক রাষ্ট্রপতি অর্ডিনান্স (প্রকট সূচনা) জারি করে এই ধারা (কিছু ব্যতিক্রম বা সংশোধন ব্যতীত) বাতিল বলে ঘোষণা করতে পারেন।

এই ধারার একটি শর্ত (Proviso) রয়েছে। বলা হচ্ছে, এই পরিবর্তনের জন্য রাজ্য সংবিধান সভার স্বীকৃতি চাই। কিন্তু আজকে এই সভার অস্তিত্বই তো নেই। যার অস্তিত্বই নেই তা কার্যকর হবে কি করে? এটাও মনে রাখা দরকার যে ধারা ৩৭০-ও অস্থায়ী। এই ধারাকে চিরস্থায়ী করার প্রয়োজন নেই। আমরা এটা জানি— ধারা ৩৭০ কাশ্মীর উপত্যকার মানুষের ভাবনার বিষয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের আরও দুইটি ভাগ রয়েছে---

(১) জম্মু ও (২) লাদাখ। জম্মু ও লাদাখের মানুষের ভাবনা-চিন্তাকেও সম্মান জানানো উচিত। এটা স্পষ্ট যে এই দুই অঞ্চলের মানুষর ধারা ৩৭০ চায় না। প্রয়োজন হলে জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের বিভাজন হওয়া দরকার। অর্থাৎ জম্মু পৃথক রাজ্য এবং লাদাখ কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল হিসেবে ঘোষিত হোক। একথাও মনে রাখা দরকার জম্মুর জনসংখ্যা কাশ্মীর উপত্যকার জনসংখ্যার সমান। জম্মুর এলাকা কাশ্মীর উপত্যকার এলাকা থেকে ১১ হাজার বর্গকিলোমিটার বেশি। জম্মুর জনসংখ্যা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অনেক রাজ্যের থেকেই বেশি। তাই জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যকে তিনভাগে বিভক্ত করার মধ্যে কোনো অনুচিত বিষয় নয়। এটা করা হলে উপত্যকার মানুষরা ধারা ৩৭০-এর বিশেষ সুবিধার আনন্দ পেতে পারে।

আমি মনে করি, এই প্রক্রিয়া বাস্তবায়িত হতে দীর্ঘ সময় লাগবে। কিন্তু রাজ্য বিধানসভায় কমপক্ষে তিনটি আইন যত শীঘ্র সম্ভব পাশ করানো দরকার। আর সেটাও রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের আগেই।

(১) জম্মুতে প্রায় ৩ লক্ষ লোক এমন আছেন যাঁরা লোকসভায় ভোট তো দিতে পারেন, কিন্তু রাজ্য বিধানসভায় ভোটদানের অধিকার তাঁদের নেই। অর্থাৎ ভারতের নাগরিক কিন্তু জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের নাগরিক নয়। এই দ্বিচারিতা এখনই দূর করতে হবে।

(২) কাশ্মীর থেকে নির্বাসিত পণ্ডিতদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। উপত্যকার বহু সংখ্যক মুসলমানদের লজ্জা হওয়া দরকার যে কাশ্মীরি পণ্ডিতরা নিজেদের পরম্পরাগত বাড়িতে নিরাপত্তা ও মর্যাদার সঙ্গে থাকতে পারে না। পণ্ডিতদের সঙ্গে তাদের পুনর্বাসন নিয়ে এখনই আলোচনা শুরু হওয়া দরকার।

(৩) অন্য রাজ্যের মতো জম্মু-কাশ্মীর রাজ্য বিধানসভার কার্যকাল ৫ বছর হোক। এখন সেটা ৬ বছর আছে। এর কোনো প্রয়োজন নেই।

আমি আশা করি, নতুন কেন্দ্র সরকার এই সব বিষয়ে যথাশীঘ্র পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

(লেখক আর এস এস-এর বরিষ্ঠ কার্যকর্তা)

ওমরের বিরুদ্ধে মুসলিম সংগঠনগুলি সোচ্চার

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ধারা ৩৭০ এবং জম্মু-কাশ্মীর নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লার বিতর্কিত মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে দেশের প্রায় সকল মুসলিম সংগঠনই সংবিধানের ধারা ৩৭০-এ যে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে। গত ৩০ মে বারাণসীর কাছে লাল্লাপুরাতে ভারতীয় আওয়াম পার্টি (রাষ্ট্রীয়)-র উদ্যোগে ৩৭০ ধারা নিয়ে আলোচনার জন্য এক জরুরি বৈঠক ডাকা হয়েছিল। প্রাক্তন সেন্ট্রাল ইনফর্মেশন কমিশনার তথা ইতিহাসবিদ ড. ও. পি. কেজরিওয়াল বলেছেন, স্বাধীনতার সময় সব থেকে বড় ভুল হয়েছে দেশবিভাগের প্রস্তাবে রাজি হওয়া এবং আরও ক্ষতিকর হলো জম্মু- কাশ্মীরের জন্য ৩৭০ ধারা আরোপ করা। বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে ভাবনা-চিন্তা করা দরকার এবং রাজ্যের মানুষের উচিত এই ধারাটিকে বাতিল করা।

সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট অশোক সেহগন বলেছেন, ভারতীয় আওয়াম পার্টি (বি এ পি) সুপ্রিম কোর্টে এই ধারার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানাবে। এই ধারা পরোক্ষভাবে পাকিস্তানকেই মদত দিচ্ছে। জম্মু- কাশ্মীর জাগৃতি মঞ্চও কেন্দ্র সরকারকে এই ধারা বাতিল করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে। জামাত উলেমা হিন্দ-এর মৌলানা সাহেব কাশমি ওমর আবদুল্লার কাছে তাঁর বিতর্কিত মন্তব্যের জন্য এক নোটিশ পাঠিয়েছে।

ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিনে শ্রদ্ধার্ঘ্য

ভারতীয় জনসঙ্ঘ থেকে বিজেপি

ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের চিন্তাধারা যতদিন যাচ্ছে ততই দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এবারে তাঁর প্রতিষ্ঠিত দল ভারতীয় জনসঙ্ঘ-এরই বর্তমান রূপ ভারতীয় জনতা পার্টি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে কেন্দ্রে সরকার গঠন করেছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় জনসঙ্ঘ থেকে ভারতীয় জনতা পার্টির বিবর্তনের রূপরেখা এই সংখ্যার স্বস্তিকায় তুলে ধরা হবে। এরই পাশাপাশি থাকছে পশ্চিমবঙ্গের শাসক দলগুলির পশ্চিমবঙ্গের স্রষ্টাকে নিয়ে উদাসীনতা— এককথায় যা লজ্জাজনক। লিখেছেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সহ-সভাপতি দুর্গাপ্রসাদ নাথানী, দিলীপ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

প্রকাশিত হবে ৭ জুলাই ২০১৪।। দাম দশ টাকা।।

সত্বর কপি বুক করুন।।

ধারা ৩৭০ কি সত্যিই জরুরি?

অজেয় ভারতী

মোদী সরকার শাসনভার গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দপ্তরের অধীন মিনিস্টার অফ স্টেট জম্মু থেকে নির্বাচিত জীতেন্দ্র সিং বলেছেন যে জম্মু-কাশ্মীরে লাগু থাকা ৩৭০ ধারাটি নিয়ে বিতর্কের সূচনা হওয়া উচিত। কথাটি বলতে না বলতেই কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা যেন ফোঁস করে উঠলেন। পারলে এখুনি ভারত ছেড়ে বেরিয়ে স্বাধীন কাশ্মীর রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান হয়ে বসেন। আক্ষরিক অর্থে তিনি বলেছেন, ''হয় ৩৭০ ধারা যেমন চালু আছে তেমনি থাকবে অন্যথায় জম্মু-কাশ্মীর আর ভারতের অংশ থাকবে না''। কাশ্মীরের মতো গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যটিকে যাকে অনেক সময়ই ভারতের প্রবেশদ্বার বলা হয় (গজনীর সুলতান মামুদ এই পথেই ১৭ বার ভারত আক্রমণ করেছিল) চিরকালীনভাবেই আবদুল্লা বংশ তাঁদের তাঁবে রেখে এসেছেন। ভোগ করেছেন বিশেষ সুবিধাভোগী রাজ্যের যাবতীয় সুযোগ। তাই আজ কেবল মাত্র আলোচনা হওয়া উচিতের প্রসঙ্গেই তিনি আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন। সঙ্গে যোগ হয়েছে আগামী বছরের আসন্ন নির্বাচনের অনিশ্চয়তা। কারণ লোকসভা ভোটে তাঁর খাতায় ৬টির মধ্যে আসন সংখ্যা শূন্য। হারানো রাজনৈতিক জমি পুনরুদ্ধারে তিনি এই বিষয়টিকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করার সুযোগ খুঁজছেন। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমরা দেশের বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট ও ওয়াকিবহাল মহলের কিছু মতামত তুলে ধরব। যেমন ওমরের হুঙ্কারের প্রতিবাদে বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকা, দি হিন্দু'র অ্যাসোসিয়েট এডিটর ও 'our moon has blood clots'-এর লেখক রাহুল পণ্ডিত বলেছেন, ''কথাটা মনে রেখ, দরকার হলে কোন লেখ্যাগারেও সংরক্ষণ করে রাখতে পার, যখন লোকে হয়ত বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করবে আবদুল্লা? সে আবার কে? তখনও কাশ্মীর কিন্তু ভারতেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ থাকবে''।

জিতেন্দ্র সিং উল্লেখ করেছিলেন যে বিজেপি নীতিগত ভাবেই ৩৭০ ধারার সুযোগ নিয়ে দেশের মধ্যে আর সব রাজ্য বাদ দিয়ে কাশ্মীর যে বিপুল সুবিধে ভোগ করে সেই ধারা বিলোপের পক্ষে। মজার কথা এই ধারা যখন স্বাধীনতার পরে পরেই চালু হয়েছিল তখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এটিকে প্রত্যাহার করে নেওয়ার কথাই সরকার বারবার বলেছিল। সে কথা এখানে নয়। ওদিকে আর এস এস-এর সর্বভারতীয় মুখপাত্র ওমর আবদুল্লার স্বার্থান্বেষী প্রতিক্রিয়ার তুরন্ত জবাব দিয়ে জানিয়েছেন ''মনে হয় আবদুল্লা পৈতৃক জমিদারির সঙ্গে ভারতের অঙ্গ কাশ্মীরকে গুলিয়ে ফেলেছেন। এটি তাঁর জমিদারি নয়। ৩৭০ ধারা থাকুক আর না থাকুক কাশ্মীর ভারতেরই থাকবে''।

এখন একটা ব্যাপার এর থেকে উঠে এসেছে তা হলো দেশবাসীর মধ্যে এই ৩৭০ ধারা নিয়ে কৌতূহল। ধারা ৩৭০ আজ স্বমহিমায় বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু হতে চলেছে। কোনো জগদ্দল পাথর তো সব সময় এক ধাক্কায় টলে না, অনেক সময় ধরে 'হেঁই মারো, হেঁই সামালও' করে তবে কাজ হয়।

উল্লেখযোগ্য ভাবে জম্মুর ভূমিপুত্র হিসেবে জিতেন্দ্র সিং-এর বক্তব্যে এই প্রথম অতি পুরাতন বিতর্কটি একটি মধ্যপন্থার দিকে যাওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। তিনি বলেছেন এই ধারা বলবৎ থাকায় কাশ্মীরবাসী উপকৃত হয়েছেন, কি ধনবান হয়েছেন, কি উন্নয়ন বিশাল গতিতে চলেছে? বর্তমানে নৈসর্গিক সৌন্দর্যের পর্যাপ্ত দেখভাল করা হচ্ছে কিনা এই সমস্ত বিষয়ই বাস্তবের নিরিখে বিচার করা দরকার। শুধু কাশ্মীর ছাড়াও দেশের আরও ২৮টি রাজ্যে এই ধারা চালু থাকা সম্বন্ধে কি অভিমত ইত্যাদি সামগ্রিক পরিসরে আলোচনা হওয়ার সময় এসেছে। মনে রাখতে হবে কোনো ব্যক্তি, সমষ্টি বা সমাজ কেউই বরাবরের জন্য এক গণ উন্মাদনায় থাকতে পারে না। আবেগ প্রশমিত হলেই যুক্তি বিবেচিত হবে।

এখন দেখা যেতে পারে ধারা ৩৭০ কি? আর কেনই বা এটি নিয়ে এত গেল গেল রব। স্বাধীনতার প্রারম্ভিক লগ্নে আমাদের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু তাঁর আর পাঁচটা হামবড়াই করা সিদ্ধান্তের মতো এই ব্যাপারটিতেও জড়িয়ে ছিলেন। তখনকার কাশ্মীরের মহারাজা হরি সিং-এর নিয়োজিত প্রধানমন্ত্রী শেখ

> **ভারতের সংবিধানে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নথিবদ্ধ আছে ধারা ৩৭০ উঠে গেলেও ধারা ১ বলে কাশ্মীর ভারতের অঙ্গ থাকবে। শুধু তাই নয়, জম্মু-কাশ্মীরের সংবিধানের ধারা ৩ মোতাবেক ৩৭০ ধারা লুপ্ত হলেও কাশ্মীর ভারত অন্তর্গত একটি রাজ্য হিসেবেই থাকবে। তাহলে ভারতীয় সংবিধানের ১ ধারা ও কাশ্মীরি সংবিধানের ৩ ধারা উভয় অনুযায়ী ৩৭০ ধারা বিলোপ পেলেও কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলেই পরিগণিত হবে।**

আবদুল্লা কাশ্মীরের ভারতের সঙ্গে মিশে গেলে নিজের ক্ষমতা হারানোর আশঙ্কা করেছিলেন। হরি সিং ভারতের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি হয়ে যাওয়াই লিখিতভাবে চেয়েছিলেন। কিন্তু নেহরু আবদুল্লার প্রতি ব্যক্তিগত সখ্যতা ও তাঁর (আবদুল্লার) কাশ্মীরি মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে এক আধা-স্বাধীন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেখকে মেনে নিয়ে একটি দেশের মধ্যে আর একটি মনগড়া আধা-স্বাধীন রাজ্য তৈরি করলেন।

তখনই চালু হলো ৩৭০ ধারা যার বলে কাশ্মীরের রইল আলাদা জাতীয় পতাকা, তাদের নিজস্ব আইনি ক্ষমতা, আরও যা কিছু স্বেচ্ছায় করা যায় তার সবই। শুধু প্রতিরক্ষা আর বিদেশনীতি ছাড়া। ওই নিজস্ব আইন প্রয়োগ করে দেশের অন্য রাজ্যের নাগরিকদের তারা কাশ্মীরে পাকাপাকিভাবে থাকতে দেয় না। ভারতের অন্য অংশের মানুষদের সেখানে ভূসম্পত্তি কেনার কোনো অধিকার স্বীকৃত নয়।

অথচ একটি আজব আগাগোড়া ভ্রান্ত অতিকথন সৃষ্টি করে বলা হয় ৩৭০ ধারা ভারত ও কাশ্মীরের মধ্যে একটি সেতুর কাজ করছে। সেতু অর্থাৎ ৩৭০ ধারা উঠে গেলেই কাশ্মীর ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে।

বলে রাখা দরকার এটি সর্বৈব অসত্য কথা। এসব ঘটার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই, ভারতের সংবিধানে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নথিবদ্ধ আছে ধারা ৩৭০ উঠে গেলেও ধারা ১ বলে কাশ্মীর ভারতের অঙ্গ থাকবে। শুধু তাই নয়, জম্মু-কাশ্মীরের সংবিধানের ধারা ৩ মোতাবেক ৩৭০ ধারা লুপ্ত হলেও কাশ্মীর ভারত অন্তর্গত একটি রাজ্য হিসেবেই থাকবে। তাহলে ভারতীয় সংবিধানের ১ ধারা ও কাশ্মীরি সংবিধানের ৩ ধারা উভয় অনুযায়ী ৩৭০ ধারা বিলোপ পেলেও কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলেই পরিগণিত হবে। সুতরাং ওই সব আজগুবি ভয় দেখানো স্বার্থান্বেষী অভিসন্ধি ছাড়া কিছুই নয়।

হ্যাঁ, নিশ্চয় একথা মানতে হবে যে পয়সাওলা লোকেরা একবার জমি কেনার অধিকার পেলেই সেখানে ছুটবে। ব্যাপক হারে ঘরবাড়ি বানাতে থাকলে সেখানকার প্রাকৃতিক ভারসাম্যের ক্ষতি হবার সম্ভাবনা। এ ব্যাপারে কেদারনাথের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা একেবারে টাটকা। এই প্রসঙ্গেও আমার দু'টি কথা বলার আছে।

(১) চিরস্থায়ীভাবে বসবাস করার অধিকার সংক্রান্ত নথি দেওয়ার বার্তা (এটি স্টেট সাবজেক্ট হওয়ার সুবাদে) রাজ্য এর সঙ্গে ধারা ৩৭০ এর কোনো সম্পর্ক নেই।

(২) এতদিন কাশ্মীরের বাইরের নাগরিকদের জন্য এত সমস্ত বাধা নিষেধ, কড়াকড়ি থাকলেও স্থানীয় বাসিন্দারাই তো সেখানকার পরিবেশের ওপর যথেচ্ছ অত্যাচার করেছে। প্রাকৃতিক ভারসাম্যের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেছে।

একটা উদাহরণ যেমন ৩০ হাজার গাছ কেটে ফেলা হলো 'মুঘল রোড' তৈরি করার জন্য। এটি একটি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক প্রকল্প শুধুমাত্র কিছু লোকের ইগো চরিতার্থ করতে আবার সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের (মুসলমান) এক শ্রেণীর অসাধু লোককে কিছু পাইয়ে দেওয়ার কারণে। উল্লেখ্য উপত্যকার জলাভূমির পরিমাণ বিপজ্জনকভাবে কমে আসছে। ব্যাপক পলি পড়া ও জবরদখলই এর জন্য দায়ী। পরিবেশ বিজ্ঞানীদের মত অনুযায়ী জলস্তর ক্রমাগত নেমে যাওয়ার ফলে এই জলাভূমি অচিরেই তার চরিত্র হারাবে। নষ্ট হয়ে যাবে এখানকার বিরল প্রজাতির উদ্ভিদ ও পতঙ্গকুল। ইতিমধ্যেই বিখ্যাত উলার হ্রদ ১৫৭.৭৪ বর্গকিলোমিটার থেকে সঙ্কুচিত হয়ে ৫৮.৭১ বর্গকিলোমিটারে এসে ঠেকেছে (১৯১১-২০০৮)। হোকারসার জলাভূমি ১৩০০ হেক্টর থেকে ৯০০ হেক্টরে নেমেছে। চির রোমান্টিক ডাল হ্রদ ৫০ বছর আগে যে দৈর্ঘ্য প্রস্থের ছিল আজ তার এক তৃতীয়াংশে পরিণত হয়েছে।

তথ্য অনুযায়ী গণ্ডারবল জেলায় চাষের জমির চরিত্র পরিবর্তন করে নির্মাণকাজ চলছে। ফলে ২০১২ সালে যেখানে ৯০৯১ হেক্টর চাষযোগ্য জমি ছিল এ বছরে তা এক ধাক্কায় ৮৪০০ হেক্টরে এসে দাঁড়িয়েছে। এটি কৃষি দপ্তরের হিসেব অনুযায়ী পাওয়া গেছে। তাঁরা আরও জানিয়েছেন এই অবস্থা চলতে থাকলে ভবিষ্যতে চাষযোগ্য জমি থাকবে না। এমন উদাহরণ ভুরি ভুরি। এই পরিপ্রেক্ষিতেই পর্যালোচনা দরকার ৩৭০ ধারার। দেখা যাচ্ছে এটি চালু থাকা অবস্থাতেই বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দিব্যি কৃষিজমি, জলাভূমি, বনভূমি বেমালুম উবে যাচ্ছে। অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর হাতে। এই ধারা চালু রাখার আরও একটি ক্ষতিকারক দিক হচ্ছে এটি বিভেদমূলক। যেমন কাশ্মীরে বসবাসকারী কোনো মেয়ে যদি ভিন্ রাজ্যের কোনো ছেলেকে বিয়ে করে সে যেমন পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবে তেমনি কোনো অন্য রাজ্যের মেয়ে এসে যদি স্থায়ী বসবাসকারী কাশ্মীরী যুবককে বিয়ে করে সেও নানান অধিকার হারাবে।

পাকাপাকি বসবাসকারী কাশ্মীরি মেয়ে বাইরের লোককে বিয়ে করলে তার ছেলেমেয়েরা মায়ের সম্পত্তি পাবে না। আবার বাইরের মেয়েরা কাশ্মীরি বাসিন্দা ছেলেকে বিয়ে করলে স্বামীর মৃত্যু বা বিবাহবিচ্ছেদ বা কোনো কারণে তার পুরনো স্থানে ফিরে গেলে কাশ্মীরের নাগরিকত্ব হারাবে।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এই বৈষম্যমূলক ধারা বলবৎ থাকায় কাশ্মীরে স্বাধীনতার ৬৭ বছর পরেও কেবলমাত্র জম্মু-কাশ্মীরের সরকারই যা কিছু চাকরি বাকরি দিয়ে থাকে। বেসরকারি নিয়োগরীতি নেই বললেই চলে। কেননা জমিটমি কিনে শিল্প মালিক হবার অধিকার তো অন্য রাজ্যবাসীর নেই। তাই সরকার চাকরি দিতে না পেরে বেকার যুবকদের যখন অন্য কিছু করার কথা বলে তারা সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে দেখে কোনো শক্তিশালী বেসরকারি নিয়োগক্ষেত্রের অস্তিত্বই নেই। ৩৭০ ধারা এটি একটি বিষময় দিক যা অনেক সময় জেহাদেরও জন্মদাতা। এই সব বিষবৃক্ষের ফলগুলি নাড়াচাড়া করলেই সচেতন ভারতীয় নাগরিক হিসেবে মনে হবে এবার সময় হয়েছে— সকলে মিলে আলোচনায় বসার। একথাই জিতেন্দ্র সিং বলেছেন। সম্মিলিতভাবে আলোচনা করে দেশের ভূস্বর্গটিকে কংক্রিট জঙ্গলে পরিণত করার চেষ্টা রুখতে হবে এবং পাশাপাশি চরম বৈষম্যমূলক ব্যবহারেও ইতি টানা দরকার। দরকার সেখানকার রাজ্য সরকারের শাসনকার্যে স্বচ্ছতা আনার এবং সেই সঙ্গে দায়বদ্ধতা ফিরিয়ে আনা।

(লেখক সাংগঠনিক সম্পাদক, জম্মু-কাশ্মীর বিচারমঞ্চ)

ধারা ৩৭০ সাম্প্রদায়িকতার কাছে আত্মসমর্পণ

এস. গুরুমূর্তি

স্বাধীনতার ষাট দশক পর ধারা ৩৭০ আজ আরো বেশি তোষণ ও ছাড় দেওয়ার দৃষ্টান্তে পরিণত হয়েছে। এর সুবাদে আরো আটটি ধারা যুক্ত হয়েছে (Article 370 A to 370 G)। সেগুলো একই ধরনের। বিশেষ অঞ্চল বা রাজ্যকে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছে এর সাহায্যে। এই অস্থায়ী আইনের সাহায্যে যেন বিশেষ মর্যাদা দানের এক অন্তহীন অভিযান শুরু হয়েছে। পাঞ্জাবের সন্ত্রাসবাদীরাও একই প্রকারের অস্থায়ী আইনের দাবিতে বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিল। এই ৩৭০ ধারাই বিভেদপ্রবণ চিন্তাকে সংবিধানসম্মত ও প্রতিষ্ঠিত করেছে। ৩৭০ ধারার বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ এই যে এটা সাম্প্রদায়িকতার কাছে আত্মসমর্পণের একটা দলিল এবং তা সত্ত্বেও এটা তোষণের মাধ্যমে উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হয়েছে।

এই আইনটি কি এতই পবিত্র যে এটাকে স্পর্শই করা যাবে না? যাঁরা আমাদের দেশীয় রাজ্যগুলোর ভারতভুক্তির ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত তাঁরা জেনে থাকবেন যে আমাদের সরকার সেই সেই রাজ্যগুলোর নৃপতিদের সঙ্গে বিধিবদ্ধ চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন। সেই নৈতিক পবিত্রকৃত চুক্তিগুলোকে শ্রীমতী গান্ধী যখন সাগরে নিক্ষেপ করলেন তখন ভারতের প্রত্যেকটি রাজনীতি তাঁর পদক্ষেপকে ঐতিহাসিক ও সামাজিক সমতাবাদ বলে অভিনন্দন জানিয়েছিল। সর্দার প্যাটেল যাকে বিশ্বাসভঙ্গ বলে সাবধান করে দিয়েছিলেন রাতারাতি তা সমতাবাদ বনে গেল। অলঙ্ঘনীয় নৈতিক প্রতিশ্রুতিকে বাতিল করা যায়, কিন্তু এইসব ভদ্রলোকেরা বলেন যে ৩৭০ ধারা বাতিল করা যাবে না। কেন?

৩৭০ ধারার ভিত্তি ছাড়া যদি কাশ্মীর ভারতের সঙ্গে না মিলিত হোত, আমাদের তাহলে কাশ্মীরকে জাহান্নামে যেতে বলা উচিত ছিল। মহারাজা হরি সিং ও শেখ আবদুল্লাই পাকবাহিনীর আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারত সরকারের কাছে সুরক্ষা চেয়ে আবেদন করেন। এটাই শুধু আমাদের পথ দেখে নিতে সাহায্য করতে পারত। তথাপি আমরা শেখকে তার পথে যেতে দিয়েছি।

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এমন কখনো ঘটে না এবং ভারতের বেলায়ও এরকম হওয়া উচিত নয়। কিছু লোক আছে যারা অপরাধ স্বীকার করে এবং বলে যে ৩৭০ ধারা কাশ্মীরের আঞ্চলিক সংস্কৃতি জনসংখ্যাগত চরিত্রকে অবশিষ্ট ভারতের উপনিবেশীকরণের প্রভাব থেকে রক্ষা করার জন্য রচিত হয়েছিল। পরিষ্কার কথায় এই বোঝায় যে কাশ্মীর সর্বদাই মুসলমান প্রধান থাকবে এবং ভারতের অন্যান্য অংশ থেকে কাশ্মীরে স্থানান্তরিত লোকের দ্বারা কাশ্মীরিরা (মুসলমানরা) সংখ্যালঘুতে পরিণত হবে না। গত ৪২ বৎসরে অসমের আটটি জেলা জনসংখ্যাগতভাবে অ-অসমীয় অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। ভারতের অপর স্থান থেকে আগত লোকেদের জন্য তা অ-অসমীয় হয়েছে তা নয়, হয়েছে কিন্তু বাংলাদেশী অনুপ্রবেশের দ্বারা। যখন অসমীয়গণ বিদ্রোহ করল এবং অনুপ্রবেশের বিপদ থেকে নিরাপত্তা চাইল তখন এই ৩৭০ ধারার protogonist-রাই ওই আন্দোলনকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিল। আট বৎসর ধরে এই বিক্ষোভকে সাম্প্রদায়িকতার ছাপ দেওয়া হয়েছিল। তাই আজ জিজ্ঞাসা এই নয় যে ৩৭০ ধারা ন্যায্য বা অন্যায্য কিনা--- রাজনীতিগত কারণে ভুল না সঠিক, সংবিধান অনুসারে ন্যায়সঙ্গত কিনা। প্রশ্ন হলো ৩৭০ ধারা কাশ্মীরের শেখ, শাহ্, মুফ্‌তিদের কাশ্মীরি পণ্ডিত ও বাইরের অন্যান্য হিন্দুদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ করবে বলে যে ধরে নেওয়া হয়েছিল তা ফলপ্রসূ হয়েছে কিনা। পরিচ্ছন্ন উত্তর— 'না'। উল্টে ওই আইনটি বার বার বিশেষ মর্যাদার কথা মনে করিয়ে দিয়ে কাশ্মীরের মুসলমানদের আরো বিভেদপরায়ণ করে তুলেছে।

ভারতের প্রবেশদ্বার

এই ধরনের বিষয়বস্তু বেশ জটিল একটি প্রসঙ্গ। বিষয়টা ব্যাপক আলোচনার অপেক্ষা রাখে। দেশের সংহতি এখানে চিন্তার বিষয়। এদেশের ইতিহাস, ভূগোল আমাদের অধ্যয়ন করতে হবে। V.P. Menon লিখেছিলেন, যে-দেশ তার ভূগোল ইতিহাস স্মরণ করে না, এরকম আচরণ সে নিজের বিনাশকালে করে থাকে। তিনি তিনটি শব্দে জম্মু-কাশ্মীরের গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছেন। ১৯৪৭ সালে ২৫ ডিসেম্বর সর্দার প্যাটেলের হয়ে যখন তিনি মহারাজা হরি সিংহের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন তখন হরি সিংহ ভারতভুক্তির জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। শ্রীমেনন ভারত সরকারকে তা অবহিত করান এবং সুপারিশ করেন যে হরি সিংহের প্রস্তাব গ্রহণ করা উচিত। সর্দার প্যাটেল তাঁকে সমর্থন করলেন, কিন্তু নেহরু বিরোধিতা করলেন। শ্রী মেনন বলেন এই কাশ্মীরের পথেই মহম্মদ গজনী সতের বার ভারত আক্রমণ করে। এটা ভারতের প্রবেশদ্বার। যারা ওই একপ্রস্থ ভূমি নিয়ন্ত্রণ করে তারাই এই বিশাল দেশ নিয়ন্ত্রণ করবে।

আমাদের বর্তমান শাসনকর্তারা ও তাঁদের বিরোধীরা কি মেননের উক্তির তাৎপর্য অনুধাবন করবেন? কাশ্মীর ভারতের প্রবেশ পথ বলেই দেশের মহা নিরাপত্তামূল্য এতে রয়েছে। ১৯৪৭, '৬৫, '৭১ সালের যুদ্ধে হাজার হাজার দেশপ্রেমিক যোদ্ধার রক্তপাতের বিনিময়ে কাশ্মীরের ভারতে যোগদান সম্পন্ন ও রক্ষিত হয়েছে। নাছোড়বান্দার মতো আমরা যেন অতীতের মিথ্যার পুনরাবৃত্তি না করে স্পষ্টবাদী হতে আরম্ভ করি। আর এর প্রথম পদক্ষেপটি হলো সংবিধানের ৩৭০ ধারাটি প্রত্যাহার ও বাতিল করা।

চিঠিপত্র

রাজকোষ শূন্য অথচ বাহারি খরচ দিব্যি চলছে

'শত্রুর শত্রু যে বন্ধু'— এই আপ্ত বাক্যটি রাজ্যের নেত্রীর ক্ষেত্রে যে সমধিক প্রযোজ্য সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না। উনি বহুরূপী নাট্যগোষ্ঠীর তৃপ্তি মিত্রকে (বিখ্যাত শম্ভুমিত্র-জায়া অভিনেত্রী) পিছনে ফেলে এসেছেন। কলকাতার ফুটবল দলের যেসব খেলোয়াড় সুবিধা অনুযায়ী দল বদল করে থাকে, তাঁরাও আজ নেত্রীর সুবিধাবাদিতার জন্য রং পাল্টানোতে লজ্জায় অধোবদন।

যে সিপিএম কিছুদিন আগেও ছিল, অর্থাৎ নির্বাচনের প্রাক্কালে, দাঙ্গাবাজ, ছাপ্পাবাজ, রিগিং মাস্টার, ধর্ষণকারী, লুণ্ঠনকারী দুর্নীতিপরায়ণ এবং আরও কত কি, হঠাৎ রাতারাতি সেই সিপিএমের সঙ্গে গলায় গলায় ভাব দেখে সন্দেহ হচ্ছে। বিমানবাবুদেরও সন্দেহ হচ্ছে স্বভাবসিদ্ধ নেত্রী আবার কবে নিজ স্বার্থসিদ্ধ হলে তাঁদের ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। কারণ উনি রাজনীতি করেন না— করেন স্বার্থপরের ন্যায় সুবিধাবাদীর নীতি। বিজেপি ওঁর মতে বর্তমানে সাম্প্রদায়িক। কিন্তু বাজপেয়ীর মতো সজ্জন ব্যক্তির মন্ত্রিসভায় ছিলেন রেলমন্ত্রী হিসাবে। কিন্তু শতকরা একশো ভাগ অন্যায় স্বার্থ পূরণ না হওয়াতে উনি মন্ত্রিসভা ছেড়ে চলে আসেন। আবার কংগ্রেসের ইউপিএ মন্ত্রিসভায় রেলমন্ত্রীর দপ্তর নিয়েও অন্যায় স্বার্থ পূরণ না হওয়াতে ওই মন্ত্রিসভা ছাড়েন। পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম-কে ডাইনে বাঁয়ে গালি দিয়ে নিজের ইচ্ছামতো সিট ছেড়ে বিধানসভা দখল করেন কিন্তু স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় কংগ্রেসকে ছুঁড়ে ফেলে দেন। অর্থাৎ দলত্যাগ ও মন্ত্রিত্ব ত্যাগ তাঁর কাছে জলভাত। তিনি সকালে উঠে সংবাদপত্রের নিকট সিপিএমকে গালি দেওয়া শুরু করতেন আর শুতে যাবার আগে পর্যন্ত তা চলত। কিন্তু রাজ্যে বিজেপি-র উত্থানও দেশে বিজেপি-র একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা তাঁর টনক নড়িয়ে দিয়েছে।

মোদীর প্রতি দিদির ভীষণ রাগ, আর তা হবেই তো পশ্চিমবঙ্গের বাড়াভাতে ছাই দিলে কার বা ভালো লাগে। এমন একদিন আসবে দিদি তখন কৃতাঞ্জলিপুটে প্রধানমন্ত্রীকে বলবেন, 'নরেনদা যা বলেছি রাজনীতির স্বার্থে বলেছি, ক্ষমা ঘেন্না করে দেবেন। আর বলছিলাম কি যে ওই যে আমাদের উৎসব অনুষ্ঠান করে করে আর সংখ্যালঘু তোষণ করে রাজকোষ শূন্য, তাই বলছি কি "ভিখারী হাজির দ্বারে, ফিরায়ো না মোরে"।

দেবু সরকার,
মেমারী, বর্ধমান।

পুরভোটেও মোদী-আতঙ্ক ?

এবারের লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে সারা দেশের মোদী-ঝড় পশ্চিমবঙ্গে মোদী-হাওয়ায় পরিণত হলেও দু'টি লোকসভা কেন্দ্রে (আসানসোল ও দার্জিলিং) ফুটেছে পদ্ম। এ রাজ্যে এত ঘাসফুল ফোটালেও তাঁর মনে বিঁধছে পদ্মকাঁটা। তাই তিনি ভীত, সন্ত্রস্ত ও আতঙ্কিত। 'জয় করেও তবু ভয়' তাঁর যেন যাচ্ছে না।

আর সেই 'ভয়াতঙ্ক' নেত্রীকে এতটাই তাড়া করে বেড়াচ্ছে যে তিনি আসন্ন পুরভোট পর্যন্ত পিছিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছেন। তাঁর ভয়, এই মোদী-হাওয়ায় পুরভোট এখনই হলে বহু পুরসভা হতে পারে তাঁর হাতছাড়া। এমনকী কলকাতা, আসানসোল ইত্যাদি পুরনিগম পর্যন্ত। আর তাহলে ২০১৬ সালে অনুষ্ঠিতব্য রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে পড়তেও পারে তার বিরূপ প্রভাব। তাঁদের ক্ষমতাচ্যুতিও অসম্ভব নাও হতে পারে।

তাই তিনি পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে দিয়ে বলিয়েছেন যে পুরভোট নভেম্বরের আগে করা সম্ভব নয়। কেন নয়? না, সবে লোকসভা ভোট শেষ হয়েছে। প্রখর রোদের মধ্যে প্রচণ্ড গরমে ভোটাররা দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিয়েছেন। তার চেয়ে বরং নভেম্বরের ঠাণ্ডার সময় ভোট হলে ভোটারদের কষ্ট-ক্লেশ যেমন লাঘব হবে, ভোটারদের উপস্থিতির হারও তেমনি বৃদ্ধি পাবে। সেটাই ভালো নয় কী?

কিন্তু রাজনীতির কারবারি, রাজনৈতিক সচেতন জনগণ ও 'মিডিয়া' তৃণমূল নেত্রীর 'শাক দিয়ে মাছ ঢাকা'র চালাকি বা আসল মতলব ধরে ফেলেছেন। ফিরহাদ যে তাঁর সর্বেসর্বা নেত্রীর ইচ্ছাটাই ব্যক্ত করেছেন তা সবারই জানা। কারণ 'কত্তার ইচ্ছায় কেত্তন' যে! তবে নেত্রী সম্ভবত ভুলেই গিয়েছেন যে নভেম্বরে স্কুলে স্কুলে বার্ষিক ও টেস্ট পরীক্ষা চলে। পরীক্ষার মরসুমে নির্বাচনী প্রচারে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনায় ক্ষতি হওয়ার কথা চিন্তা করে ওই সময়ে কোনো নির্বাচন রাখা হয় না। এটাই নিয়ম। আর সেই নিয়ম মেনেই এদেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় মার্চের পরে। তাই প্রশ্ন, তৃণমূল নেত্রী এসব জেনেও কেন এত বড় ভুলটা করলেন? তবে তিনি কী নভেম্বরে বিনা প্রচারেই করবেন নীরবে পুরভোট?

সত্যিই কী মমতা ভেবেছেন যে নভেম্বরে ভোট হলে তিনি স্বস্তি পাবেন? সব পুরসভা তাঁর দখলে চলে আসবে? নভেম্বরে মোদী- হাওয়া বিলীন হয়ে যাবে? মোটেই না। বরং ওই সময়ের মধ্যে বিভিন্ন দল থেকে দলে দলে অসংখ্য নেতা-কর্মী এসে ঢুকবে বিজেপি-তে। ফলে বিজেপি হবে আরও শক্তিশালী। তখন? তখন যদি 'শ্যাম-কুল' দুই হারাতে হয়! কথায় বলে, 'অন্ধ হলেও প্রলয় বন্ধ থাকে না।' তৃণমূল নেত্রীর কী এসব অজানা?

ধীরেন দেবনাথ,
কল্যাণী, নদীয়া।

বাংলায় এবার রাজনৈতিক 'সিন্ডিকেট' তৈরি হলো

শ্যামলকুমার হাতি

আকাঙ্ক্ষাটা ছিলই। তবে এত তাড়াতাড়ি তার প্রকাশ পাবে এটা ভাবা যায়নি। আমরা পশ্চিমবঙ্গবাসী সবাই জানতাম আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুতেই বিজেপির উত্থান মানতে পারবেন না। গত লোকসভা নির্বাচনের সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে নরেন্দ্র মোদীকে আক্রমণ করেছেন তাতে এই বাংলার কারা খুশি হয়েছিল তা আমরা সকলেই অনুমান করতে পারি। সেই তারা কিছুতেই এই রাজ্যে বিজেপি'র উত্থান মেনে নিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেবে না। তারা বারবারই মনে করিয়ে দেবে যে তারাই দিদির আসল চালিকা শক্তি। তাই নির্বাচনের সময় বা আগে দিদি যেভাবে আশা করেছিলেন তাতে ভারতের গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষেরা ছাই ঢেলে দিয়েছেন। দিদির বড়ই আশা ছিল দিল্লীর সরকার গঠনে নির্ণায়ক ভূমিকা নেবেন। তা না হওয়ায় তিনি প্রকৃত অর্থে হতাশ। ৩৪টি লোকসভার আসন জয় করার পরও মনে বড়ই অশান্তি। মোদী সরকারের সঙ্গে কীভাবে কথা বলে বাংলার উন্নতি করবেন তার কোনো রোডম্যাপ আজও তৈরি করতে পারেননি। তিনি খানিকটা দিল্লীর সরকারকে উপেক্ষাই করছেন। কেউ বোকা নন— এটা আজ তিনি হাড়ে হাড়ে অনুভব করছেন।

গত ৩৪ বছর ধরে বাংলায় জগদ্দল পাথরের মতো একটা অত্যাচারী খুনে সরকার ছিল। মানুষ তার থেকে পরিত্রাণ চাইছিল। ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে দিল্লী থেকে একজন শক্তিশালী অফিসারকে এখানে নির্বাচনী পর্যবেক্ষক করে পাঠানো হয়েছিল। তারই সক্রিয়তায় বাংলার মানুষ দীর্ঘদিন বাদে নিজের মতামত প্রকাশ করতে পেরেছিল, সেই শুরু। একটা একটা পাথর খসতে খসতে ২০১১ সালে বিধানসভা নির্বাচনে বাংলার মানুষ হাতখুলে মমতার দলকে সমর্থন করেছিল। বাংলায় পরিবর্তন এসেছিল। মানুষ একটু হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল, অত্যাচারী, অহঙ্কারী বামফ্রন্ট এবং সিপিএম-কে রাতারাতি পথে বসিয়েছিল। তারপর যা হয়েছিল— এখন বাংলার লোকেদের মনে তা তাজা হয়ে আছে। একে একে পাড়ায় পাড়ায় যে সমস্ত গুণ্ডা বদমাইশরা সিপিএমের পতাকার আড়ালে মানুষের উপর জোর জুলুম করত তারা ঝাণ্ডা বদল করল। নতুন ঝাণ্ডা নিয়ে সেই একই কাজ করতে লাগল। মমতার রূপ চিনতে মানুষের সময় লাগল না। তাই খুবই দ্রুত মমতা ও তার দলের প্রতি সাধারণ মানুষের ভালবাসা ও আস্থাও কমে গেল। মানুষের যত আস্থা কমেছে ততই ওরা ভায়লেন্ট হয়েছে। যে সমস্ত লোকেরা কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস দলটি গঠন করেছিল ক্রমে তারাই পিছনের সারিতে চলে গেল। তাদের উপরও নব তৃণমূলীরা সমানে অত্যাচার করতে লাগল। তারাই 'আর দেরি নয়' বলে এবারে এই বাংলায় বিজেপি-কে আশীর্বাদ করেছে। ব্যাস, এতেই তৃণমূল সুপ্রিমোর রাতের ঘুম চলে গিয়েছে। একে সামনে নরেন্দ্র মোদী, তার উপরে বিজেপি-র প্রতি মানুষের আস্থা— আর থাকতে না পেরে তিনি বাম প্রতিনিধি দলকে সময় দিয়ে নবান্নে ফিশফ্রাই, ক্রীম রোল, মিষ্টি, চা খাইয়ে আপ্যায়ন করেছেন। জামাই আদর বললেও ভুল হবে না। এটা তো বাংলার জ্যৈষ্ঠ মাসই। না হয় একটু দেরি হলো। ওতে দোষ নেই।

হঠাৎ করে কেন এই বাম প্রীতি? আসলে এবার বিজেপি-কে শুধু শুধু সাম্প্রদায়িক বলে গাল পাড়লে লোকে নেবে না। তাই দল ভারী করা আর কি! টিএমসি-তো একটা দল। বামফ্রন্টে তো অনেক দল। ওরা তো বহুবচন। টিএমসি তো একবচন। তাই বাংলার মানুষকে এবার এরা সবাই মিলে ভুল বোঝাবে। বিহারের নীতিশ-লালু এক হলে বাংলায় বাম-টিএমসি এক হবে না কেন? লালু-নীতিশ-কে দেখে দিদির মাথায় এটাই ঘুরপাক খাচ্ছিল। সুযোগ আসতেই কাজে লাগানো আর কি! মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহজে বিজেপি-র উত্থান মেনে নেবেন এটা ভাবাই যায় না। বিশেষ করে যখন এবারের নির্বাচনে নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী কতগুলি মৌলিক পরিবর্তন ঘটাতে সমর্থ হয়েছেন। তা হলো— (ক) ছাত্র এবং যুবকদের রাজনীতি মুখী করতে পেরেছেন। (খ) একক দল কেন্দ্রে সরকার গঠন করতে পারে সেই হারিয়ে যাওয়া বিশ্বাস ফিরিয়ে এনেছেন। (গ) সংখ্যালঘু তোষণ করেই কেবল জেতা যায় এই মিথ্যা 'মিথ'টা ভেঙে দিয়েছেন। (ঘ) উন্নয়ন ও সুশাসন দিয়ে নির্বাচন জেতা যায় তাও তিনি প্রমাণ করেছেন। তাতেই মানুষের মন মজেছে। তাই দলে দলে সাধারণ মানুষ বিজেপি-মুখী হয়েছেন।

তাতেই সংখ্যালঘু তোষণকারী মেকি ধর্মনিরপেক্ষরাই আজ বলা যায় নবান্নে একটা 'রাজনৈতিক সিন্ডিকেট' গঠনের প্রয়াস শুরু করেছে। এটাই চিন্তা। রাজারহাটে যেভাবে সিন্ডিকেট-রাজের অত্যাচার চলছে। এবার রাজনৈতিক নয়া সিন্ডিকেটের মাধ্যমেও ওরা চক্রান্ত করবেই। তাই চোখ কান খুলে রাখার সময় এখন। ■

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের
মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

দশাবতার ও ভারতের জাতীয় জীবন

বরাহ-অবতার

ড. ইন্দ্রজিৎ সরকার

'বসতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্না
শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না।
কেশব ধৃত শূকররূপ, জয় জগদীশ হরে।।'

ভগবান বিষ্ণুর তৃতীয় অবতার বরাহ। ইনি আপন দন্তাগ্রে বসুধাকে ধারণ করে রক্ষা করেছিলেন। বরাহ অবতারের কথা বলতে গেলে সেই সময়ের সামাজিক রাজনৈতিক অবস্থার কথা বলা প্রয়োজন। ভারতে যখন একটি জাতি গঠিত হয়েছে, ধীরে ধীরে সেই জাতি শক্তিশালী হয়ে উঠছে, ভারতের বৈভবের কথা বিশ্বে প্রচারিত হচ্ছে, ভারতের সভ্যতা-সংস্কৃতি সকলের ঈর্ষার বস্তু হয়ে উঠেছে, তখন বহিঃশত্রুর আক্রমণ শুরু হলো। ভারতবর্ষে প্রথম বিদেশি লুণ্ঠনকারী হিরণ্যাক্ষ দৈত্য। ভারতের ঐশ্বর্যের (হিরণ্য) দিকে সর্বপ্রথম তার দৃষ্টি (অক্ষ) পড়ায়, বোধহয় তার এরকম নামকরণ হয়েছিল। হিরণ্যাক্ষ ক্রূরকর্মা ও পরাক্রমশালী ছিল। অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন, হত্যা এসব তার নিত্যকর্ম ছিল। তার অত্যাচারে পাঞ্জাব অঞ্চল জনবিরল হয়ে গেল। এই অবস্থার বর্ণনা করতে গিয়ে পুরাণকাররা বললেন যে, পৃথিবী যেন ক্রমে ডুবে যাচ্ছিল। সমাজ কথার অর্থ পৃথিবী, ভূমি বা দেশ যাই বলা হোক না কেন, এতে রাষ্ট্রীয় চেতনার দৃঢ়তাই ফুটে উঠেছে। এই হিরণ্যাক্ষরূপী ঘোর সঙ্কট থেকে যিনি সেসময় দেশকে রক্ষা করেছিলেন, তিনিই বিষ্ণুর বরাহ অবতার।

এই বরাহ অবতার প্রথম ভাড়াটে সৈন্য ব্যবস্থার প্রচলন করেছিল এবং সেই সব ভাড়াটে সৈন্যের সাহায্যে হিরণ্যাক্ষকে পর্যুদস্ত করে তার অত্যাচার থেকে দেশকে উদ্ধার করেছিল। ভাড়াটে-সৈন্যের মধ্যে বরাহের সকল গুণ থাকে। তারা অপরিচ্ছন্ন অর্থাৎ ন্যায়-নীতি- ঔচিত্যবোধের ধার ধারে না। এরা সবসময় হুকুম তামিল করতেই অভ্যস্ত। এই রকম উপযুক্ত সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে যিনি বিদেশি আক্রমণকারীকে সংহার করেছিলেন, সেই লোকোত্তর পুরুষকে অবতার বলে গণ্য করা কি স্বাভাবিক নয়? এই অদ্ভুত সূক্ষ্মবোধ ও কর্মকুশলতায় যিনি বিদেশি আক্রমণকারীদের প্রতিহত করেছিলেন, তাঁর কথা-কাহিনী অমর করে রাখার জন্য পুরাণকারগণ বরাহমুনির কথা প্রতিষ্ঠিত করেন। বরাহ যে সকল স্থানে যুদ্ধ করে হিরণ্যাক্ষকে পর্যুদস্ত এবং পরে হত্যা করেছিল সেইসব স্থানে বরাহমুনির পীঠ 'বরাহমূলম' স্থাপিত হয়। যার একটির নাম প্রাকৃতজনের ভাষায় এখনও 'বারমুলা' নামে প্রচলিত। বরাহ অবতারের দাঁতের উপর জলমগ্ন পৃথিবী-গোলকের চিত্র এই কাহিনীর সত্যতা প্রমাণ করে।

বৈদিক বর্ণনায় বরাহ অবতার যেভাবে দেখি, পুরাণে সেভাবে দেখতে পাই না। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও শতপথ ব্রাহ্মণ অনুসারে প্রজাপতি ব্রহ্মা বরাহরূপ ধারণ করে জলমগ্ন পৃথিবীকে জলে ডুবে উদ্ধার করেন। কিন্তু পুরাণে বিষ্ণুর বরাহরূপ ধারণের কথা বলা হয়েছে। 'হরিবংশ' অনুসারে ভগবান বিষ্ণু দুইবার বরাহরূপ ধারণ করেছিলেন— প্রথমবার পৃথিবীকে জলতল থেকে রক্ষা করার জন্য আর দ্বিতীয়বার হিরণ্যাক্ষকে বধ করার জন্য। কালিকাপুরাণে বরাহ অবতারের বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে, এক বরাহ পৃথিবীকে ধর্ষণ করার পর যে সন্তান-সন্ততি সৃষ্টি হয় তারা মন্দ স্বভাবের হওয়ায় মহাদেব সেই বরাহকে বধ করেন। তাই বরাহের ভিন্ন-ভিন্ন অবয়ব থেকে সকল জন্তুর উৎপত্তি হয়। এই বর্ণনার বাস্তব অর্থ এই দাঁড়ায় যে, ভাড়াটে সৈন্যরা হিরণ্যাক্ষ নিধনের পর শাসনভার নিজেদের হাতে নিয়ে ভোগময় উৎশৃঙ্খল জীবন যাপনে ব্যস্ত হয়ে পড়লে চিন্তাশীল ব্যক্তিরা তীব্র তিরস্কার করে তাদের কর্তব্যের দিশা দেন। ফলে আবার নিজ নিজ যোগ্যতা অনুসারে যুগোপযোগী জীবন- যাপন আরম্ভ হয়। কর্নেল টড রচিত 'রাজস্থান' গ্রন্থের 'জয়সলমীর' পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, অতি প্রাচীনকাল থেকেই সিন্ধু-বালুচিস্তানে 'বরাহ' নামে এক রাজপুত জাতি ছিল।

রাজস্থানের জয়সলমীরের ভট্টি ঘরানার মধ্যে এদের বিবাহ সম্বন্ধ প্রচলিত ছিল। এই লোকেরা বর্তমানে ধর্মভ্রষ্ট হয়ে মুসলমান হয়েছে। বাবরের 'আত্মচরিত' গ্রন্থেও এই 'বরাহ' জাতির কথা আছে। মনে হয়, 'বরাহ' অবতার নামে যে ব্যক্তি পুরাণে খ্যাত হয়েছিলেন, তাঁরই বংশধর অথবা অনুগামী

সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এদেরও ‘বরাহ’ নাম হয়েছিল। সুতরাং ‘বরাহ’ কোনো জন্তু নয়, জন্তুর গুণযুক্ত কোনো মানব-সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী; যেমন মৎস্য বা কূর্ম ছিল মানবগোষ্ঠী।

এইভাবে যদি বিশ্লেষণ করা যায় তবে পুরাণের কল্পকথার ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব। এইভাবে মৎস্য, কূর্ম ও বরাহ এই তিন অবতারের কথা বিচার করলে দেখা যাবে, জাতিগঠনের ক্ষেত্রে প্রধান দু’টি অঙ্গের অর্থাৎ দেশ ও জনগণের প্রাসঙ্গিক বিকাশ ভারতবর্ষে কেমনভাবে ঘটেছে। আর যেসব পুরাণকার ঋষি এই ঘটনাগুলিকে রূপকের মোড়কে পরিবেশন করেছেন, ধন্য তাদের প্রতিভা! কারণ, রূপকের নির্মোক না থাকলে এইসব কাহিনী হাজার হাজার বছর ধরে অপরিবর্তনীয় রূপে অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারতো না।

মৎস্য অবতারে যে ভূখণ্ড ও জাতি গঠিত হলো, কূর্ম অবতারে যে জাতি ন্যায়-নীতিগত বৈশিষ্ট্যলাভ করে স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করল, বরাহ অবতারে সেই জাতির জাতীয়তাবোধ আরও দৃঢ়তরভাবে ফুটে উঠল। সেই জাতি বৈদেশিক শত্রুকে, বিদেশি লুণ্ঠনকারীকে Mercenary army গঠন করে পর্যুদস্ত করল। এইভাবে একটি দেশ, একটি জাতি আপন বৈশিষ্ট্যে গড়ে উঠতে লাগল। সৃষ্টি হলো রাষ্ট্র ধারণা। একটি রাষ্ট্র গঠনের প্রাথমিক শর্ত হলো একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ও একটি জনগোষ্ঠী বা জনসমাজ। মৎস্য অবতার নির্ধারণ করে দিয়েছে, ‘নেশন’-এর বীজ বপন করে দিয়েছে। কূর্ম অবতার ন্যায়-নীতি নির্ধারণ করে সেই জাতিকে আরও দৃঢ়, আরও বলিষ্ঠ, আরও ঐক্যবদ্ধ করেছে। আর বরাহ অবতার সেই ঐক্যবদ্ধ দৃঢ় জনসমাজ থেকে Mercenary army তৈরি করে হিরণ্যাক্ষের মতো বিদেশি লুণ্ঠনকারীর হাত থেকে ভারতভূমিকে রক্ষা করেছেন। বরাহ- অবতারের কালে আমাদের স্বাজাত্যবোধ, স্বাভিমান অনেক বেশি দৃঢ় হয়েছে। হিরণ্যাক্ষ বধের মধ্যে দিয়ে ভারতীয়দের মনে অন্যায় অধর্মের রাজত্ব উৎখাত করে ন্যায় ও ধর্মরাজ্য স্থাপনের আকাঙ্ক্ষাই প্রস্ফুটিত হয়েছে। এই ধর্মরাজ্য স্থাপনের অভীপ্সাই একটি জাতির মানসিক উন্নতির পরিমাপক। আজ থেকে হাজার হাজার বছর আগে ভারতীয়রা সেই উন্নত মানসিকতার উজ্জ্বল পরিচয় দিয়ে গেছেন; বরাহ অবতারের কাহিনীতে তারই প্রতিফলন, তারই এক কাব্যসুষমায় অনবদ্য প্রকাশ। ■

KIND ATTENTION TO HOUSE OWNERS

"WATER SEAPAGE IS A DISEASE LIKE A CANCER OF YOUR DREAM HOME. REMOVE IT AND SAFE YOUR HOME"

OUR SERVICES :

** Heat & Waterproof Solution for your Heated Roof.
** Waterproof Treatment of Roof, roof Garden Water Tank, Lift Pit, Water Body Etc.
** Leakage, Dampness & Salt Petre Treatment.
** Anti-Termite & Pest Control Treatment

CONTACT :

Calcutta Waterproofing Company
'Park Plaza'
71, Park Street, Room No. 11/12, Kolkata-700 016
98311 85740/9831272657–
emil : roy4258@yahoo.com,
web : www.calcuttawaterproofing.com

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

গান্ধী -জননী পুতলীবাঈ

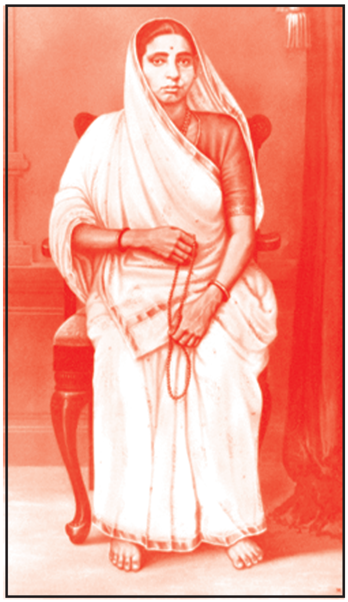

রূপশ্রী দত্ত

মহাত্মা গান্ধী— যিনি 'বাপু' নামে সমগ্র দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্র ছিলেন। তাঁর জননী পুতলীবাঈ আমাদের এবারের আলোচ্য ব্যক্তিত্ব।

'The hand that rocks the cradle, rules the world'— প্রবচনটি যে-কোনো মনীষীর জননীর মতো পুতলীবাঈ সম্পর্কেও খাটে। শৈশবে জননীর প্রভাব গান্ধীর সমগ্র জীবনেই পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। পুতলীবাঈ বৈশ্যসম্প্রদায়ভুক্ত পরিবারের কন্যা। তাঁর পিতৃগৃহে ধর্মের পবিত্র ঐতিহ্য কঠোরভাবেই পালিত হোত। তিনিও সমগ্র জীবনে সেই আদর্শই অনুসরণ করে গেছেন। পুতলীবাঈ জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮৩৯ খৃস্টাব্দে। তাঁর বিবাহ হয়েছিল নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত করমচাঁদ গান্ধীর সঙ্গে। করমচাঁদ তখন চল্লিশের কোঠায় পদার্পণ করেছেন। এর আগে তাঁর তিনজন পত্নী মারা যান। সেই পক্ষে তাঁর দুই কন্যা-সন্তান ছিল। কালক্রমে পুতলীবাঈ চার সন্তানের জননী হন। সর্বকনিষ্ঠ মোহনদাস জন্মগ্রহণ করেন ১৮৬৯ খৃস্টাব্দে। পুতলীবাঈ-এর বয়স তখন ত্রিশ।

পুতলীবাঈ ছিলেন বুদ্ধিমতী ও গুণবতী। তিনি যেমন বহির্জগতে, রাজন্যবর্গের সমাবেশে স্বচ্ছন্দ ছিলেন, তেমনি সাবলীল ছিলেন পরিবার ও গৃহকর্মেও। তবে তাঁর নিজের গৃহ এবং পরিবারই তাঁর কাছে অধিকতর গুরুত্ব লাভ করত। সন্তানদের জন্য তিনি অকুণ্ঠ ত্যাগস্বীকার করেছেন। পরিবারে কেউ অসুস্থ হলে তিনি রাতদিন তার সেবায় নিযুক্ত থাকতেন। সাজসজ্জার ব্যাপারে তিনি ছিলেন একেবারেই উদাসীন। মূল্যবান পোশাক পরিচ্ছদ তিনি পরিহার করে চলতেন। ত্যাগ, ব্রত ও উপবাস ঘিরে তাঁর জীবনচক্র আবর্তিত হোত। মন্দির ও গৃহ— দুই স্থানেই তাঁর অবস্থানের সময়সীমা তিনি ভাগ করে নিয়েছিলেন। তাঁর এই পবিত্র জীবনচর্যা, তাঁর সন্তানদের কাছেও প্রশংসনীয় ছিল।

এই ধর্ম-সংক্রান্ত আত্মনিগ্রহ, ত্যাগস্বীকার— পুতলীবাঈ অনেক সময় কিছু অভিনব বিষয়ের মাধ্যমেও ঘটিয়েছেন। মাঝেমাঝেই তিনি প্রতিজ্ঞা করতেন, কোকিলের ডাক যতক্ষণ না শুনবেন, ততক্ষণ খ্যাদ্যগ্রহণ করবেন না। একদিন অনেক সময় অতিবাহিত হলেও, কোকিলের ডাক কিছুতেই কর্ণগোচর হচ্ছে না। বালক মোহনদাস দীর্ঘসময় মাকে উপবাসী দেখে ব্যথিত হয়েছিলেন। তিনি তখন বাড়ির পিছনে দাঁড়িয়ে কোকিলের স্বরে ডেকে বাড়িতে এসে বলেছিলেন— কোকিলের ডাক শোনা গেছে। পাছে, উপবাসে মায়ের মৃত্যু হয়, তাই বালকপুত্র এহেন চাতুরির আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিন্তু মায়ের নিকট তিনি ধরা পড়ে গিয়েছিলেন। আসল কোকিলের ডাক না শুনে অন্ন গ্রহণ করলে পাপ হবে— তাই গান্ধীর অনুরোধেও তিনি অন্নগ্রহণ করেননি। উপরন্তু সাশ্রুনয়নে বলেছিলেন— 'কি পাপ করেছি যে এমন মিথ্যাবাদী পুত্রের মা হতে হলো। তিনি বালক মোহনদাসকে প্রতিজ্ঞা করিয়েছিলেন— আর কখনও যেন তিনি মিথ্যা না বলেন। গান্ধী আমরণ সেই মাতৃ-সকাশে গৃহীত শপথ অক্ষুণ্ণ রেখেছিলন।

পুতলীবাঈ-কে দেখে পুত্র মোহনদাসের মনে হয়েছিল— নারীর আদর্শ হওয়া উচিত প্রেম ও স্বার্থত্যাগ। দৃঢ় ও ঋজু স্বভাবের পুতলীবাঈ কনিষ্ঠ সন্তানের মধ্যেও তার ছাপ রেখে গিয়েছিলেন। জননীর কাছ থেকেই তাঁর শিক্ষা— পরিবার ও সম্প্রদায়কে অতিক্রম করে সমগ্র মনুষ্য সমাজের প্রতি প্রেম।

সরকারের সঙ্গে মতবিরোধে করমচাঁদ ও পুতলীবাঈকে সপরিবারে রাজকোট ত্যাগ করতে হয়। দশ বছর পর করমচাঁদ সেখানে মারা যান। ১৮৯১ সালে পুতলীবাঈ-এর মৃত্যু হয়। ■

জাতীয়তাবাদী বাংলা
সংবাদ সাপ্তাহিক
স্বস্তিকা
পড়ুন ও পড়ান
প্রতি কপি ১০.০০ টাকা

গড়ে তোলার কাজ

স্কুলে গাছ লাগানো উৎসব

কৌশিক গুহ

গাছ লাগনো হবে বর্ষা শুরু হওয়ার পর— অজয়-স্যার বলেছিলেন। গাছ লাগানো হয় যেদিন তার আগে থেকেই ব্যবস্থা হয়। কোথায় কোন গাছ বসানো হবে তা ঠিক করার পর জায়গাটা তৈরির ব্যবস্থা থাকে। সপ্তর্ষিদের স্কুলে গাছের চারা রোপণ করার দিনটা রীতিমতো উৎসবের মতো। প্রত্যেকটা ক্লাসের ছেলেরা দায়িত্ব ভাগ করে নেয়। নতুন শিশুবৃক্ষ রোপণের সঙ্গে সঙ্গে পুরনো গাছের যত্নের কথাও মনে থাকে। হেড-স্যার গাছ ভালোবাসেন বলে প্রতি বছর ব্যাপারটা জোরদার রূপ নেয়। গাছ লাগানোর সঙ্গে একটা সভা হয়। গাছের প্রয়োজন, পরিবেশ রক্ষা এসব নিয়ে ছাত্ররা বলে। যে যেমন খুশি বলতে পারে। গান হয়। বৃক্ষরক্ষার কথা নানাভাবে জানানোর ব্যবস্থা থাকে। ছোটোরা ছবি আঁকে চারপাশের গাছ নিয়ে। বেশ মজায় কাটে দিনটা। স্কুলের পক্ষ থেকে প্রত্যেককে কিছু খাওয়ানো হয়। সবশেষে একটা করে গাছের চারা প্রত্যেকে নিয়ে যায় বাড়ি। ছোট টবে থাকে। হেড-স্যার বলেন, 'এই চারা বাড়ি নিয়ে গিয়ে যত্নে রাখবে। দু'একদিন বাদে মাটিতে কিংবা বড় টবে লাগিয়ে দিতে পারো। গাছের যত্ন করতে হবে প্রতিদিন। মনে রাখবে আর বলবে, এটা আমার গাছ আমাদের বাড়ির গাছ। আমার বন্ধু, আমাদের বাড়ির প্রত্যেকের বন্ধু। গাছ ছাড়া আমাদের চলবে না।' ওই দিন স্কুলে পড়া হয় না ঠিকই, কিন্তু পড়ার থেকে অনেক বেশি কাজ হয়। প্রতি বছর বর্ষার সময় ওই দিনটার জন্যে অপেক্ষা করে থাকে সপ্তর্ষিরা।

এবছর খুব বেশি গরম পড়েছিল। সপ্তর্ষিদের স্কুলের দেয়াল খুব মোটা। তাপ কম ঢোকে। বাড়ি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছিল যাতে খুব গরম পড়লেও অসুবিধে না হয়। স্কুলের ক্লাস ঘরে গরম কম লাগলেও বাড়িতে পাড়ায় রাস্তায় সূর্যের তাপে সব যেন ঝলসে যাচ্ছিল। গরমের ছুটির পর স্কুল খুলেছে। আর কয়েকদিনের মধ্যে বর্ষা এসে যাবে। অজয়-স্যার বলেছেন, 'প্রচুর গাছ কাটা হয়েছে বেপরোয়া ভাবে। জলাজমি ভরাট করা হয়েছে। একের পর এক বাড়ি তৈরি হয়েছে চারপাশে। গাছ লাগানো হয়নি ঠিকভাবে। আবহাওয়া বদলে গেছে। গরম বেড়েছে। বৃষ্টির পরিমাণ কমেছে। আমাদের বাঁচার জন্যে গাছ চাই— এটা বুঝতে হবে সকলকে। তোমরা বলবে বড়োদের। তোমাদের কথা শুনবে বইকি বড়োরা।'

এবারে গাছ লাগানোর দিনটা নিয়ে ভালো মতোন চিন্তা ভাবনা হয়ে গেল। এই উৎসবের নাম : 'বন-মহোৎসব।' অজয়-স্যার বলেছিলেন, 'শুধু গাছ লাগালেই হবে না। গাছ সম্বন্ধে সচেতন হওয়া দরকার। বছরে একদিন গাছ উৎসবে মাতামাতি করে সারা বছর গাছের কথা ভুলে গেলে এই উৎসবের কোনও মূল্য থাকবে না। গাছের যত্ন চাই প্রতিদিন। গাছ নিয়ে ভাবতে হবে রোজ। আর সকলকে যুক্ত করে নেওয়া দরকার।' পোস্টার তৈরি হলো অনেক। পাড়ার মধ্যে পদযাত্রা হবে তা নিয়ে। আঁকা ছবি আর আলোকচিত্রের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হলো। বৃক্ষরোপণ নিয়ে বিতর্ক বক্তৃতার ব্যবস্থাও থাকল। একটা সুন্দর কার্ড তৈরি করে ছাপানোর ব্যবস্থা হয়েছিল। তাতে লেখা কয়েকটি কথা : 'আমাদের প্রয়োজনে গাছকে বন্ধু করে নিতে হবে।'

অনুষ্ঠান বেশ জমে গেল। সকলের মনের মধ্যে একটু যেন ঢেউ উঠল। সপ্তর্ষি একটা ছবি এঁকেছিল গাছ নিয়ে। ছবিটা টাঙানো ছিল প্রদর্শনীতে। সারাদিনের সব অনুষ্ঠান ভালোভাবে দেখেছে। আগের বছর অত ভালো করে বোঝেনি। এখন একটু বড়ো হয়েছে তো— তাই বুঝতে পারে। দাদাই গাছ লাগানোর কথা বলে। স্কুলে কি হলো তা বাড়ি ফিরে দাদাইকে বলতে হবে। গাছের যে চারাটা স্কুল থেকে দিয়েছে সেটা তুলে দেবে দাদাইয়ের হাতে। ওদের বাড়িতে এখন অনেক গাছ।

স্কুল থেকে বেরোবার সময় অজয়-স্যারকে সপ্তর্ষি নিজের হাতে আঁকা একটা কার্ড দিল। খুব খুশি হয়ে পিঠ চাপড়ে দিলেন। তারপর দিলেন একটা কার্ড। লিখে দিলেন : 'ছোট্ট সপ্তর্ষি, এই মন নিয়ে বড়ো হয়ে ওঠো।'

ছবি : রমাপ্রসাদ দত্ত

বই কথা কই

পবনজেঠুর বই

শুভাশিসের পবনজেঠুর সংগ্রহ বাতিকটা খুব বেশি। কারো কাছে কিছু দেখলেই সেটা কেনার জন্যে ছটফট করে। টাকা পয়সার টানাটানি নেই। বরং বাড়তি টাকা ভালো মতোন রয়েছে। অতএব যেমন খুশি খরচ করো। কারও বলার কিছু নেই। পবনজেঠুর বউ মানে শুভাশিসের জ্যেঠিমা কিছু বললে চুপ করে থাকে পবনজেঠু। যেন কিছুই শুনতে পাচ্ছে না— এমন ভাব। জ্যেঠিমা কিছুক্ষণ বকবক করে অন্যদিকের কোনো প্রতিক্রিয়া না দেখে হাল ছেড়ে দেয়। পবনজেঠু স্বস্তি পায়। সেসময় হাজির হয় শুভাশিস। জেঠু বলে, ‘বড়রকম ঝড় গেল একটা। তুই রায়দের খাবারের দোকান থেকে কিছু কিনে আন। দুজনে খাবো। তোর জ্যেঠিমার জন্যে একটা আইসক্রিম আনিস।’ শুভাশিস জানে জেঠু খেতে খুব ভালোবাসে। কিছুটা দৃষ্টি-খিদে রয়েছে। দোকানে সাজানো খাবার দেখলেই ছটফট করে। আর অল্পতে তার হয় না। কাউকে ভালো জামা গেঞ্জি পাঞ্জাবি পরতে দেখলে জেনে নেবে কোথায় পাওয়া যায়। তারপর দেরি না করে কিনে ফেলবে। অনেক ব্যাপারেই অন্যের দেখাদেখি চাহিদা তৈরি হয়ে যায় মুহূর্তের মধ্যে। তার জন্যে ছটফটানি শুরু হয়ে যায়। না সংগ্রহ করলে স্বস্তি নেই। জ্যেঠিমা ওইরকম অপচয় বা অপব্যয় দু'চোখে দেখতে পারে না। কিন্তু চেঁচামেচি করে লাভ হয় না। খুব দরকার না হলে জেঠু কথা বলে না জ্যেঠিমার সঙ্গে। তার যুক্তি, কথা বললে গোলমাল বাড়বে। তার বদলে চুপচাপ থাকা ভালো। একটু চেঁচিয়ে থেমে যাবে। জ্যেঠিমা যতক্ষণ চেঁচাবে ততক্ষণ মনে মনে একটা গান গায় জেঠু। ‘তুমি যা বলো তাই বলো আমি চলবো আপন মনে। ওই কথাটাই শোনাবো নিজেকে আর সব কাছের জনে।’ মনে মনে ওই গানটা গায় বলে জ্যেঠিমার কড়া কড়া কথা দিব্যি হজম করে নেয়। শুভাশিস মজা পায় দুজনের কাণ্ড দেখে।

বই কেনার শখ আছে জেঠুর। নানারকম বই কিনে ফেলে। কেউ হয়তো বলল, ‘অমুক বইটা পড়ে নিন খুব ভালো।’ পবন-জেঠুর মাথায় ঢুকে গেলে বইটার জন্যে আঁকপাঁক করবে। কেনার পর হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে। সঙ্গে সঙ্গে পড়বে তা নয়। বইটা তার সংগ্রহে আছে— এই কথাটা বলার মধ্যে খানিকটা গর্ব লুকিয়ে থাকে। পবনজেঠু বই সংগ্রহ করে, কিন্তু পড়ার সময় অবকাশ বা উৎসাহ থাকে না। অনেক বই ওইভাবে জোগাড় করতে হয়েছে। বই অবশ্য যত্নে থাকে। পবন-জেঠু বইয়ের যত্ন নেয়। কোনো বই না-পড়া নেই। শুভাশিস স্বাধীনতা পেয়েছে বই নাড়াচাড়া করার।

কদিন আগে জানতে পারল শুভাশিস, সমস্ত বই জেঠু দিয়ে দেবে পাড়ার লাইব্রেরিতে। আলমারি সমেত। ছোটোদের জন্যে যেসব বই রয়েছে তা থাকবে লাইব্রেরির ছোটোদের বিভাগে। পবনজেঠু বলেছে, ‘বইগুলো অনেক বছর ধরে সংগ্রহ করেছি, যত্নে রেখেছি। আর রাখা যাবে না। বয়স হয়েছে। শরীর কেমন থাকবে কে জানে! তার আগে বইগুলো লাইব্রেরিতে দিতে পেরে নিশ্চিন্ত হলাম।’ শুভাশিস জানতে পারল লাইব্রেরির সকলে বই পেয়ে খুব খুশি। জেঠুর সংগ্রহ বাতিক ছিল বলে ওইরকম হলো। তবে জ্যেঠিমা খুশি কি জেঠুর সিদ্ধান্তে? সেটা জানতে পারেনি শুভাশিস।

বইমিত্র

গাছ চাই, আরও গাছ

দেশ এখন পর্যন্ত ১৫ জন মহিলা মুখ্যমন্ত্রী দিয়েছে

শুভশ্রী দাস

সুচেতা কৃপালানি নন্দনী শতপথী শশিকলা কাঁকোনকর সৈয়দ আনোয়ারা তৈমুর জানকী রামচন্দ্রন জে জয়ললিতা মায়াবতী

আনন্দীবেন প্যাটেল রাজেন্দ্র কৌর ভট্টল রাবড়ি দেবী সুষমা স্বরাজ শীলা দীক্ষিত উমা ভারতী বসুন্ধরা রাজে মমতা ব্যানার্জি

ভারতবর্ষ চিরকালই নারীজাতিকে উচ্চ আসনে বসিয়েছে। বর্তমান যুগেও নারী স্বমহিমায় উজ্জ্বল। আমাদের দেশ এখন পর্যন্ত ১৫ জন মহিলা মুখ্যমন্ত্রী দিয়েছে। তাঁদের মধ্যে অনেকে রাজ্যশাসনে দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। দেশ তাঁদের চিরকাল স্মরণে রাখবে।

দেশের প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন সুচেতা কৃপালনী। তিনি ১৯৬৩ সালে অক্টোবর থেকে ১৯৬৭ সালের মাস পর্যন্ত উত্তরপ্রদেশের কংগ্রেস সরকারের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন।

১৯৭২ সালে নন্দিনী শতপথী ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী হন। তিনি দু'বার মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। তার পরের বছরই গোয়ায় মহারাষ্ট্রবাদী গোমন্তক পার্টি শশিকলা কাঁকোনকরকে মুখ্যমন্ত্রী করে। তিনি ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৯ পর্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮০ সালে সৈয়দ আনোয়ারা তৈমুরকে হঠাৎই অসমের মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিনি ছয়-সাত মাস দায়িত্ব পালন করে মহিলা মুখ্যমন্ত্রী-সূচিতে যুক্ত হন। ১৮৮৮ সালে এম জি রামচন্দ্রনের মৃত্যুর পর তামিলনাড়ুর রাজনীতিতে অস্থিরতা উৎপন্ন হলে এ আই এ ডি এম কে অস্থিরতা উপশমের জন্য তাঁর পত্নী জানকী রামচন্দ্রনকে মুখ্যমন্ত্রী পদে বসায়। বিধানসভায় তিনি গরিষ্ঠতা প্রমাণ করতে পারলেও সেই সময় রাজীব গান্ধী সরকার ৩৫৬ ধারার অপপ্রয়োগ করে ২৩ দিনের জানকী রামচন্দ্রনের সরকারকে বরখাস্ত করে। তবু তিনি খুবই কম দিনের মহিলা মুখ্যমন্ত্রী-তালিকায় আছেন। জানকী রামচন্দ্রনের রাজনৈতিক জীবন এম জি রামচন্দ্রনের অনুগামী জে জয়ললিতা একপ্রকার শেষ করে দেন। জয়ললিতা প্রথমে তামিলনাড়ু বিধানসভায় প্রথম মহিলা বিপক্ষ দলনেতা ছিলেন, পরে তামিলনাড়ুর দ্বিতীয় মহিলা মুখ্যমন্ত্রী রূপে দায়িত্ব পালন করেন। সেই সময় এ আই এ ডি এম কে-র সঙ্গে কংগ্রেসের জোট ছিল। জয়ললিতা মোট ৪ বার মুখ্যমন্ত্রী হন। বর্তমানেও তিনি তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী।

উত্তরপ্রদেশের দলিত নেত্রী ও কাঁশীরামের সহযোগী মায়াবতী ১৯৯৫ সালে মুখ্যমন্ত্রী হন। তিনি ৪ বছর মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। পাঞ্জাবে ১৯৯৬ সালে কংগ্রেস নেত্রী রাজেন্দ্র কৌর ভট্টল মুখ্যমন্ত্রী হন। তিনি এক বছরের বেশি সময় দায়িত্ব পালন করেন। বিহারেও লালুপ্রসাদ যাদব গো-খাদ্য কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে জেলে গেলে তাঁর স্ত্রী রাবড়ি দেবী ১৯৯৭ সালে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি তিনবার বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হন।

ভারতীয় জনতাপার্টির প্রভাবশালী নেত্রী সুষমা স্বরাজ দিল্লীর প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। ১৯৯৮ সালে বিশেষ পরিস্থিতিতে তাঁকে মুখ্যমন্ত্রী করা হয়। কিন্তু তাঁর নেতৃত্বে পার্টির জয় না হওয়ার ৫১ দিনের কার্যকাল সমাপ্ত হয়। এরপর দিল্লীর ক্ষমতা কংগ্রেসের প্রভাবশালী নেত্রী শীলা দীক্ষিতের ওপর পড়ে। তিনি মুখ্যমন্ত্রী হন এবং একনাগাড়ে ১৫ বছর মুখ্যমন্ত্রিত্ব করেন। মহিলা মুখ্যমন্ত্রী রূপে সর্বাধিক সময় দায়িত্ব পালনের রেকর্ড একমাত্র তাঁরই আছে। ২০১৩ সালে কংগ্রেস-বিরোধী হাওয়ায় তাঁর পরাজয় ঘটে। তাঁর রাজত্বকালেই দিল্লীতে কুখ্যাত নির্ভয়া কাণ্ড ঘটে। প্রখর নেত্রী উমা ভারতীও মধ্যপ্রদেশে দিগ্বিজয় সিং সরকারের কুশাসনের সমাপ্তি ঘটিয়ে বিজেপি রাজের শুরু করেছিলেন। তিনি ২০০৩ থেকে ২০০৪ মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। একই বছরে রাজস্থানেও প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রীরূপে বসুন্ধরা রাজে ক্ষমতাসীন হন। তিনি দু'বার বার রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী হন। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে ২০১১ সালের ২০ মে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে। ৩৪ বছরের বাম অপশাসন হটিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হন।

মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর সর্বশেষে সংযোজন গুজরাটের আনন্দীবেন প্যাটেল। বর্তমান ভারতের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হওয়ায় ১৫তম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী রূপে তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। গুজরাট সরকারের মন্ত্রীমণ্ডলীর মধ্যে আনন্দীবেন প্যাটেলই সবচেয়ে অভিজ্ঞ মন্ত্রী ছিলেন।

সুতরাং ভারতে নারী জাগরণ অব্যাহত। চাই শুধু একটু সদিচ্ছা। আনন্দের বিষয়, ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনে সংসদে ৬১ জন মহিলা সাংসদ জিতে এসেছেন। তাই আশা করা যায় নারী নিগ্রহকারীরা কঠোর শাস্তি পাবে। ■

অতিথি কলম

স্বপন দাশগুপ্ত

ওবামার কালো তালিকায় থাকা মোদী একদম সাদা স্লেট নিয়েই শুরু করলেন

দু'চারদিন হলো এমনিতে মোদীর ওপর তীব্র নজরদারি রাখা মিডিয়ার নজর এড়িয়ে কয়েকটি গোষ্ঠী যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে মোদীর নিবেদিতপ্রাণ সমর্থক ছিল তাঁদের কেউ কেউ যেন একটু হালকা বিরোধিতার আভাস দিচ্ছেন। কারণটা আর কিছুই নয়, এই গোঁড়া মোদী ভক্তের দল রাষ্ট্রপতি ওবামার নেমন্তন্ন মোদীজীর তৎক্ষণাৎ স্বীকার করে নেওয়াটা ঠিক মেনে নিতে পারছেন না। সূত্র অনুযায়ী যেমনটা শোনা যাচ্ছে, এই মোদী ভক্তদের সকলেই সর্বার্থে সোশ্যাল মিডিয়ার থাকা স্যামের (ওবামা) ওপর কোনো বিজাতীয় ঘৃণা পোষণ করেন না। তবে খুব ক্ষুদ্র একটা অংশের ক্ষেত্রে এমনটা হতেও পারে। এই ক্ষুদ্রাংশের মত অনুযায়ী গুজরাট দাঙ্গাকে অজুহাত করে মুখ্যমন্ত্রী মোদীকে যে ওবামা প্রশাসন দীর্ঘদিন ভিসা দিতে অস্বীকার করেছিল এখন আগ বাড়িয়ে ভিসা দেওয়ার আগে তাদের প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে। এঁদের আরও দাবি যে সমস্ত মধ্যস্থতাকারী তাদের পদের সুযোগ নিয়ে মোদীর বিপক্ষে কুৎসা রটিয়ে ওবামার কান ভারি করেছিল তাদের সকলের নাম প্রকাশ করতে হবে। কথাটা কিন্তু ফেলে দেওয়ার নয়। এর মধ্যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সৃষ্টি ও বিনষ্টির ক্ষেত্রে কত অকিঞ্চিৎকর ব্যক্তিত্ব নিজের দর বাড়িয়ে স্বার্থ চরিতার্থ করতে পারে তার একটা স্বচ্ছ ধারণাও পাওয়া যেতে পারে।

ভাবতে বুক স্ফীত হয়ে ওঠে, সেই ব্যক্তিটি যখন স্বগরিমায় ভারতের প্রতিনিধি হয়ে এ বছরের শেষ নাগাদ একের সঙ্গে এক মুখোমুখি হতে আমেরিকার সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাদা বাড়িতে প্রবেশ করবেন। তখন তাঁর কোনো নৈতিক প্রতিবন্ধকতা থাকবে না। অন্যদিকে আমরা ভাবব এই সেদিন ১৬ মে অবধি যারা মানুষটিকে অচ্ছুত করে রেখেছিল আজ তাদের প্রথম নাগরিক তাঁকে সাদরে তাঁর বাসগৃহে অভ্যর্থনা করছেন।

প্রসঙ্গত আমাদের দেশে যারা ভেদাভেদ, তারতম্যের কূটনীতি করতে অভ্যস্ত তাদের এ ব্যাপারটাকে বিরাট অন্যায় দাবি বলে মনে করার কারণ নেই। সম্পূর্ণ একপক্ষীয় ভাবে অগ্রপশ্চাৎ যাচাই না করে ঘোরা ফেরা করা 'পবিত্র পাপী'দের কথায় একজন নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রীকে ভিসা দিতে অস্বীকার করাটা মামুলি কূটনৈতিক দাঁও প্যাঁচ নয়। এর মধ্যে লুকিয়ে আছে আরও কুৎসিত ইঙ্গিত। ভিসা অস্বীকার করার মাধ্যমে আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেন্ট একদিকে শুধু ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিকেই প্রভাবিত করার চেষ্টা করেনি, একই ঢিলে ভারতের বিচার ব্যবস্থার ওপরও একটা প্রচ্ছন্ন বার্তা দেওয়ার অপচেষ্টা করেছিল। বলা ভাল এই ধরনের ভয়ঙ্কর ঔদ্ধত্যপূর্ণ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে যে সমস্ত মানুষ এ যাবৎ তেমন আমেরিকা-বিরোধী হওয়ার যুক্তি পায়নি তাদের একটা বিপুল অংশ ওবামা বিদ্বেষী হয়ে ওঠে। এমন প্রকাশ্য বৈষম্যমূলক আচরণ আমেরিকার তরফে না দেখানো হলে, বেশ মনে হয় ২০০৯ সালের পরমাণু চুক্তি স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে হয়ত লোকসভায় অত প্রকাশ্য আড়াআড়ি বিভাজন দেখা যেত না। তখন জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল, যে সরকার মোদীকে ভিসা দেয়নি তারা জ্ঞানে-অজ্ঞানে শাসক কংগ্রেস দলেরই তাঁবেদার ও স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায় অবশ্যই বিজেপি-বিরোধী। এই বৈরিতার কি বিশেষ প্রয়োজন ছিল, আজ তাঁরা ভাবছেন। কিন্তু ভারত আমেরিকার যুগ্ম প্রচেষ্টায় কাজ করার ক্ষেত্রে এই ঘটনা দুঃখজনক হয়েই থাকবে।

সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে যখন দিনের পর দিন নরেন্দ্র মোদীর প্রাসঙ্গিকতা, গুরুত্ব ও জনসমর্থন বেড়ে চলেছে তখন বিষয়টা আদৌ অনুধাবন করতে না পেরে মুখ ফিরিয়ে থেকে আমেরিকা যে কূপমণ্ডুকের কাজ করেছিল তা নিশ্চিত। তবে এর মূলে কি ছিল তাদের

ভারতে অবস্থিত দূতাবাস কর্মীদের চরম মূর্খামি নাকি ভারতের নানা প্রান্তে নিযুক্ত তথাকথিত বিদ্বজ্জনের মাধ্যমে পাওয়া ভেজাল খবরাখবর? এখানেই শেষ নয়, মিডিয়া ও এনজিও-র বড় একটা অংশ ছাড়াও সেই মহাপণ্ডিত জাতীয় নিরাপত্তা অধিকর্তারাও তাঁদের ডুবিয়েছিলেন। বিষয়টা রাতারাতি ফাঁস হবে বলে মনে হয় না। তবে হ্যাঁ, ওয়াশিংটনের এ ব্যাপারে সাবধান হওয়ার সময় এসেছে। মোদীর এই আকাশচুম্বী সাফল্যের বিপ্রতীপে প্রমাণ হয়েছে আমেরিকার জ্ঞানী মধ্যস্থতাকারীদের অতলান্ত অপদার্থতা ও ভারতের জমিন বাস্তবতার সঙ্গে তাঁদের চরম বিচ্ছিন্নতা।

প্রসঙ্গত আরও একটি বড় সমস্যাও ছিল। রাষ্ট্রপ্রধান ওবামা যে কখনই অর্থনৈতিকই হোক আর কৌশলগতই হোক ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখে কাজ করতে চাননি তা আজ আর গোপনীয় কিছু নয়। ওবামা তাঁর মেয়াদ শেষ করে অফিস গুটিয়ে আফগানিস্তান থেকে সফলভাবে সেনা প্রত্যাহার নিয়ে খুবই চিন্তিত ছিলেন। ওই বিক্ষুব্ধ দেশ থেকে পাততাড়ি গোটানোর পর সেখানকার জেহাদিরা ভারতের পক্ষে কতটা নিরাপদ হবে বা দ্বিপাক্ষিক কি ধরনের নিরাপত্তা পরিকল্পনা করা যেতে পারে এসব কথা ভাবার তিনি প্রয়োজনই মনে করেননি। এ থেকে এটা পরিষ্কার বড় দাদার দেশ ওয়াশিংটন তার নিজের দেশ, নিজের নাগরিকের নিরাপত্তা বিঘ্নিত না হলে আর কাউকে গ্রাহ্যই করে না। তাই চিন্তাস্তরে যদি বাস্তবিকই কোনো গভীর পরিবর্তন না আসে তাহলে সত্যিই মোদী-ওবামার সাক্ষাৎকারটি দু'চারটি আপাত তাৎপর্যহীন বাক্য বিনিময় আর কঠিন; কিন্তু আদতে অত্যন্ত শিথিল করমর্দনের মাধ্যমে আলোকচিত্রীদের সুযোগ করে দেওয়ার পরিধির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। তবুও আগামী সেপ্টেম্বরে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভায় যোগ দিতে বিশ্বের যে ৮০টি দেশের প্রতিনিধি নিউইয়র্কে জড়ো হবেন তাঁদের মধ্যে প্রথমবারের অতিথি হবেন ভারতের সদ্য নির্বাচিত নেতা মোদী। সেই অতিথিকেই বিশেষভাবে ডেকে নেওয়া হচ্ছে হোয়াইট হাউসে। এই পরিস্থিতিতে মোদী হয়ত অতীত ঘটনা মনে রেখে প্রতিস্পর্ধী হয়ে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করতে পারতেন। কিন্তু তা সুষমামণ্ডিত হোত না। এককভাবে ব্যক্তি-মোদীকে টার্গেট করা আমেরিকার পক্ষে চরম ভুল হয়েছিল আর তাই এই পর্বটিও ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় ইউএসএস এন্টারপ্রাইজ-এর বঙ্গোপসাগরে পৌঁছে যাওয়ার পর পালানোর মতোই বরাবর তাদের ভাবনায় খচখচ করবে। ভারতের অকারণ রক্ষণাত্মক হবার কোনো কারণ নেই। ভাবতে বুক স্ফীত হয়ে ওঠে, সেই ব্যক্তিটি যখন স্বগরিমায় ভারতের প্রতিনিধি হয়ে এ বছরের শেষ নাগাদ একের সঙ্গে এক মুখোমুখি হতে আমেরিকার সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাদা বাড়িতে প্রবেশ করবেন। তখন তাঁর কোনো নৈতিক প্রতিবন্ধকতা থাকবে না। অন্যদিকে আমরা ভাবব এই সেদিন ১৬ মে অবধি যারা মানুষটিকে অচ্ছুত করে রেখেছিল আজ তাদের প্রথম নাগরিক তাঁকে সাদরে তাঁর বাসগৃহে অভ্যর্থনা করছেন। তাহলে কি হঠাৎ ওবামা সাহেবের মোদীর ওপর কোনো আবেগতাড়িত ভালবাসার জন্ম হলো? আরে না না, ভারতের গণতন্ত্রের অন্তর্নিহিত শক্তিকে অগ্রাহ্য করার মতো নৈতিক জোর আর কারুরই নেই। ভারতীয় গণতন্ত্র আজ অপ্রতিরোধ্য।

(লেখক একজন বিশিষ্ট স্তম্ভলেখক)

নেত্রদান মহাদান

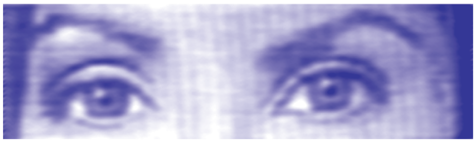

EYE BANK

23580201, 23341628, 23592931
Mobile - 9830333451

অনুসন্ধান ঃ 22181995, 22180387

সৌজন্যে ঃ কলাভারতী

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৭০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার,
যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

বিশেষ নিবন্ধ

এবার একটু বুকভরা নিশ্বাসের আশা

বাকপতি মিশ্র

'আমি ভাই ওসবের মধ্যে নাই', 'এখানে ওই সব দল বা সংগঠন করলে বাঁচা যাবে না', —এগুলো একান্ত আলাপচারিতার কথা। আর প্রকাশ্যে? 'আমরা এখানে হিন্দু-মুসলমান মিলেমিশে থাকি, আর ওরা সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করে দাঙ্গা বাঁধাতে চায়'। বক্তাগণের রাজনীতি? বামপন্থী সিপিআইএম বা আরএসপি আর ডানপন্থী কংগ্রেস বা তৃণমূল কংগ্রেস। সদ্য শেষ হওয়া লোকসভা নির্বাচনে তথাকথিত সেই হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাবাজ রাজনৈতিক দল 'ভারতীয় জনতা পার্টি' সারা ভারত জুড়ে যেন এক বিদ্রোহের রথে চড়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে কেন্দ্রে সরকার গঠন করেছে কয়েকদিন হলো। তবে ষোল তারিখ নির্বাচনের ফলাফলের গতিপথ পরিষ্কার হতেই ওই বক্তাদেরই একজন কানের কাছে এসে ফিসফিস করে বলল, 'আমরা তো স্বাধীন ভারতের পাকিস্তানে বাস করি, এবার নিশ্চয়ই একটু মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারব'। তার পর থেকে ক্রমাগত শুনছি 'এবার আমাদের হরিনামের নগরপরিক্রমায় কেউ বাধা দিতে পারবে না', 'এবার থেকে আমাদের উপর হামলা করতে পারবে না' ইত্যাদি।

এতক্ষণ আমি যাঁদের কথা বলছি আশা করি তাঁদের মোটামুটি চেনা গেছে। তবে আর একটু পরিষ্কার করে বলি এরা এই বাংলার মুর্শিদাবাদের জেলার হিন্দু নামক অদ্ভুত প্রাণী, আর এটাই এই জেলার হিন্দুদের চারিত্রিক গঠন ও শান্তিতে জীবনযাপনের চালচিত্র। গত বৎসর একটা মন্দিরের হরিনাম যজ্ঞের পর নগর পরিক্রমায় (ধুলোট উৎসবে) আমিও সঙ্গী হয়েছি। প্রায় হাজার নারী ও পুরুষ ভক্তের মিছিল। রাজ্য সড়ক ধরে বাজারের মধ্যে তখন পরিক্রমা, মিছিলের একেবারে শেষে আমি, কানে এল দু'জন মুসলমান দাদার আলাপ— 'আমরা দু'জন সামনে গিয়ে দাঁড়ালে একটাকেও দেখা যাবে না, পালানোর পথ পাবে না।' এ থেকে এখানে হিন্দুদের অবস্থা যেমন বোঝা যায়, তেমনি মুসলমান দাদাদের মনভাবটা পরিষ্কার— হিন্দুদের এই আস্পর্ধা চক্ষুশূল। প্রধান রাস্তার উপর মসজিদ বিরাজমান। বাজাতে বাজাতে যাবার চেষ্টা করে। কারণ, হিন্দুদের বিয়ে, নগরকীর্তন বা প্রতিমা বিসর্জনের শোভাযাত্রা যাইহোক রাস্তার পাশে থাকা মসজিদকে নীরবতায় সালাম ঠুকে তবেই যেতে হবে, নতুবা হামলা। বিশ-পঁচিশ বছর আগে প্রায়শই এমন হামলা ও হাতাহাতি হতে দেখেছি। বামনাবাদে

> **এই বাংলার এই ফলকামী হিন্দুরা যারা সবার আগে গোঁফে তেল লাগিয়ে কাঁঠাল খাবার জন্য তৈরি হয়ে গেছে তারা এই মহাবিপ্লবে কি করেছে? প্রায় কিচ্ছু না বললেই চলে। আর এই মুর্শিদাবাদের এই হিন্দুরা? যাঁরা মনে করে এই অসহনীয় পরিস্থিতি থেকে বাঁচার পথ নরেন্দ্র মোদী ও তাঁর দলের কাছে সেই প্রত্যাশা করে, তাঁরা নিজেদের সেই প্রত্যাশা পূরণের জন্য কি করেছে? জেলার তিনটি লোকসভা কেন্দ্রেই মোদীর দলের জামানত বাজেয়াপ্ত করে ছেড়েছে।**

কিছুদিন আগে একটা হিন্দু পরিবারের বিয়ে বাড়ির মানুষ বাজনা-সহ চলেছে নদীর ঘাটে মঙ্গলঘট ভরতে। মসজিদের সামনে আসতেই ধর্মাত্মা মুসলমানরা মারমুখী হয়ে বেরিয়ে এল মসজিদ থেকে, তারপর চড়-থাপ্পড় আর গালাগালি টানাটানি। পুরুষরা ভ্যাবাচ্যাকা, মেয়েরা আতঙ্কে কেঁদে উঠছে। পবিত্র সাদা পোশাক, লম্বা দাড়ি আর ফেজ টুপি সজ্জিত এক ধর্মাত্মা মৌলবি রক্তচক্ষু করে তাঁর স্বজাতীয় ভাইদের প্রতি হুকুমই জারি করলেন '...(বিচ্ছিরি একটা গালি দিয়ে) হিন্দুদের দুকান গুলায় দে আগুন ধরিই।' বেচারা বিয়ে বাড়ির লোকেরা আনন্দের অসতর্কতায় মহাঅপরাধ করে ফেলেছিল মসজিদের সামনে দিয়ে বাজনা দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জনের পথে আক্রমণ ও সেই সূত্রে শিক্ষক জগদীশ সাহাকে নির্মম ভাবে হত্যার ঘটনা সবারই জানা। বেলডাঙ্গায় প্রতিমার শোভাযাত্রায় বার বার ঘটে যাওয়া হামলার ঘটনাও সকলের জানা। কিন্তু এগুলো তো সংবাদে উঠে আসা কয়েকটা নমুনা মাত্র, শতাংশের হিসাবেও আসে না। গ্রামের ভিতরের রাস্তা হোক বা প্রধান রাস্তা, সর্বত্র রাস্তার গা ঘেঁষে মসজিদ গজিয়ে উঠছে, আর তারপর হিন্দুদের পরম্পরাগত ধর্মাচার ও ধর্মীয় অধিকারে আঘাত নেমে আসছে। ঝাউবোনা ও সংলগ্ন ত্রিমোহিনী বাজারের হিন্দুদের সমস্ত দোকান ভেঙে লুঠপাট, বাড়িতে আক্রমণ ও খুন-জখমের সন্ত্রাস প্রায় দিনের ঘটনা। এই সময় নওদা,

হরিহর পাড়া ও বেলডাঙ্গা থানার সর্বত্র রাস্তার মোড়ে, চায়ের দোকানে, হাটে-বাজারে, রাস্তা চলতে মসজিদে মসজিদে হিন্দুদের প্রতি গালাগালি, খিস্তিখামারি, শাসানি, অপপ্রচার দ্বারা হিন্দুদের ত্রস্ত করে তোলা ও এই পরিস্থিতিতে সবকিছু সহ্য করে হিন্দুদের আতঙ্কিত হয়ে গুটিয়ে থাকা আমি দেখেছি। নওদা থানার পাটিকাবাড়ি-চাঁদপুর গ্রামের হিন্দুদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সেখানে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ পরিচালিত একটা বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য স্বামী প্রদীপ্তানন্দ মহারাজ উদ্যোগ নিলে সম্মিলিত মুসলমান বিরোধিতায় দীর্ঘ দিন ধরে আটকে আছে। প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের কাছে সমস্যা সমাধানের আবেদন জানিয়েও কোনো ফল দেখা যাচ্ছে না। ন্যায় বা অন্যায় হোক তাঁরা সংখ্যালঘু মুসলমানদের আবদার মেটাতেই বদ্ধপরিকর। বহু ছোট হিন্দু গ্রাম থেকে হিন্দুরা ধর্মাচারে বিধিনিষেধ, মেয়েদের নিরাপত্তার অভাব, গবাদি পশু-সহ ফসল চুরি ও মস্তানিতে অতিষ্ঠ হয়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে। ফলে এরকম অনেক হিন্দু গ্রামই হিন্দুশূন্য বা সেই পথে। অন্যান্য গ্রাম-গঞ্জের অবস্থাসম্পন্ন হিন্দুরা শহরমুখী। প্রায় সকলেই জেলাসদর বহরমপুরে একটা করে বাড়ি করে রেখেছে, কি জানি কখন পালাতে হয় এই আশঙ্কায়।

পুলিশ-প্রশাসনের কাছে গিয়ে কোনোদিনই কোনো লাভ হয়নি। তাই অবশেষে হিন্দুরা বিপদ এড়াতে চুপচাপ সালাম ঠোকাটাকেই রীতি হিসেবে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। 'এখন হঠাৎ করে হেন্দু ব্যাটাদের এমন সাহস!' তার শাস্তি হাতে গরম দিয়ে দিল, কিন্তু হিন্দু দোকান আর দোকানদারেরা কি এমন অপরাধ করল যে হিন্দুদের দোকান পোড়ানোর ফতোয়া জারি হলো? তাঁরা কি নিজ ধর্মের বলে বিয়েবাড়ির লোকেদের পক্ষ নিয়েছিল? পাল্টা হামলা করেছিল? না, তাঁরা বিপদ-সঙ্কেত বোঝে, পরিবেশ পরিস্থিতির অভিজ্ঞতা তাঁদের যথেষ্ট; তা ছাড়া সে বুকের পাটা থাকলে তো সেলাম ঠোকারই প্রয়োজনই পড়ত না। তাহলে হিন্দুদের দোকান পোড়ানোর আদেশ হলো কেন? বিদ্বেষটাতো মনে আছেই, তাই অজুহাত তৈরি হলেই সেটা ফেটে পড়ে। কয়েকদিন আগের ঘটনা, এক গরিব বৃদ্ধা স্থানীয় মতুয়া মহিলাদের সঙ্গে মেলামেশায় তাঁদের অনুরাগী হয়ে পড়ে। মতুয়াদের এক উৎসবে যোগ দিতে নিজের গ্রাম থেকে দু'-তিন কিলোমিটার দূরের সেই মতুয়া পল্লীতে যাচ্ছিলেন একাকী, সঙ্গে ছিল একটা 'ডঙ্কা' (মতুয়ারা যা বাজিয়ে হরিনাম করে)। হরিনামও করছিলেন না, বাজাচ্ছিলেনও না। পথ একটাই, বড় একটা মুসলমান গ্রামের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। মতুয়াদের হরিনামের ডঙ্কা— মুসলমানদের চক্ষুশূল হলো। একজন দৌড়ে এসে বৃদ্ধার কাছ থেকে কেড়ে নিল, লাথি মেরে ভেঙে দিতে গেল, পাশ থেকে অন্য এক মহানুভব মুসলমান তাকে থামিয়ে বৃদ্ধাকে আচ্ছা করে শাসানি দিয়ে সেটা ফেরত দিয়ে দিল। এমন ঘটনা প্রায় প্রতি দিনের। চোরের খুব উৎপাত, প্রাচীর লাফিয়ে চোর বাড়ির মধ্যে ঢুকল, হিন্দুগেরস্থ দেখতে পেয়ে একটু জোরে গলা ঝাড়লেন। কারণ, চোরটা মুসলমান, আর মুসলমান চোরকে ধরলে বা মারলে এমনকী পুলিশে নালিশ করলে বাড়িতে সম্মিলিত হামলা ও লুঠপাট হয়ে যাবে। রাস্তা চলতে মুসলমানদের গায়ে বা মুসলমানের গোরু-ছাগলে ধাক্কা লাগলে বিপদ, উল্টোটা হলে ব্যথা জায়গায় হাত নিয়ে চুপচাপ বাড়ির পথ ধরতে হবে। মুসলমানের জমিতে হিন্দুর গোরু-ছাগল গেলেই বিপদ, উল্টোটা হলে ক্ষতি স্বীকার করে চুপচাপ থাকাই পথ। হিন্দুর গাছের আম-কাঁঠাল মুসলমানে পাড়বে তা তাঁদের অধিকার, কিন্তু কোনো হিন্দু বাচ্চা ছেলে এ কাজ করে ফেললে তবে জরিমানা তো হবেই সঙ্গে বাড়ি বয়ে চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার ফাউ। রথের মেলা, পূজার মেলায় মুসলমান রোমিওরা হিন্দু মেয়েদের শরীরে হাত মারতে দলে দলে ভিড় জমায়, কিছু বললে হামলা। ফলে প্রায় মেলাই বন্ধ হয়ে গেছে। যেগুলো চলছে সেগুলোতে কিছু মুসলমানকে কমিটির সদস্য করে নিয়ে মুসলমান দুষ্কৃতীদের থেকে মেলাকে রক্ষা করার চেষ্টার আবরণে আত্মসমর্পণের দ্বারা চলছে। হিন্দুর পূজা, নগর-সংকীর্তন, মেলা যাই হোক পুলিশের অনুমতি ও সুরক্ষা নিতেই হবে এবং পুলিশের নির্দেশিত বেড়াজাল মেনে চলতেই হবে; কিন্তু মুসলমানদের ক্ষেত্রে অনুমতিরও প্রয়োজন পড়ে না। আজকাল মার্চ-এপ্রিল মাস জুড়ে গ্রামে গ্রামে মুসলমানদের ধর্মসভার (জলসা) খুব রমরমা। এক একটা ধর্মসভায় প্রায় এক কিলোমিটার জুড়ে অসংখ্য মাইক লাগিয়ে দিন-রাত্রি ব্যাপী তারস্বরে জলসা চলে কিন্তু প্রশাসনের কোনো অনুমতির প্রয়োজন হয় না, আর মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার মধ্যে হলেও যেহেতু মুসলমানদের ধর্মসভা তাই প্রশাসন দেখতে ও শুনতে পায় না। এই ধর্মসভার মুসলমান ধর্মনেতাদের কিছু নমুনাও তুলে ধরা প্রয়োজন। "ভাইসব! গোরু হলো হেন্দুদের ভগবান, হেন্দুরা গোরুর পুজু করে, মা বলে, আর আমরা গোরু জবাই করে খাই, খেয়ে হজম করে ফেলি। আমরা তো হেন্দুদের ভগবানের থেকে বেশি শক্তিশালী। হেন্দুদের উচিত আমাদের পুজু করা। তাই লয় ভাইসব?" "ভাইসব! হেন্দুরা বলে সব ধর্ম নাকি সমান, ওদের কালী আর আমাদের ফতেমা নাকি এক; তোবা তোবা! ওদের কালী ন্যাংটা, জিভ বের করা, তার উপরে আবার নিজের মরদের বুকে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, এ্যাক্কেবারে লজ্জাসরম নাই ভাইসব; আর আমাদের ফতেমা পর্দানসীন থাকে, পরপুরুষের মুখ দেখেও না, দেখতেও দেয় না। আল্লাহর দোয়ায় এই দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম হচ্ছে ইসলাম, ইসলামের সঙ্গে আর কোনো ধর্মের তুলনা হতে পারে না, সমানও হতে পারে না। ভাইসব! হেন্দুদের শাস্ত্রে তো আমাদের নবীসাহেবের কথা লিখা আছে, ওঁদের পুজুর মন্তোরে মহান ইসলাম ধর্মের কথা লিখা আছে। সেই জন্যি পুজুর মন্তর পড়তে গিই যিখানে নবীসাহেব আর ইসলাম ধর্মের কথা আছে সেখানে বামুনরা জোরে জোরে ঘণ্টা লরায়, যাতে হেন্দুরা শুনতে না পায়।" —এ রকম অনেক কোটেশন তুলে দেওয়া যায়। আজকাল মোবাইল ফোনের দোকানগুলোতে এই বক্তব্যগুলো চিপ্ লোড হয়ে অতি জনপ্রিয়তার সঙ্গে বিক্রি হয়ে

থাকে ও মুসলমান ভাইদের হাতে হাতে বেজে থাকে, যে কেউ দেখে নিতে পারে।

ধর্মসভার নামে এই পরধর্ম বিদ্বেষটাও পুলিশ-প্রশাসন ও আমাদের সংবাদমাধ্যম দেখতে পান না। আজকাল সাংবাদিকের অভাব নেই, সংবাদের জন্য সর্বদা ক্যামেরা হাতে ছুটছে; এক সাংবাদিককে বললাম, ‘‘অমুক জায়গায় পরীক্ষার কারণে কীর্তনের আসর থেকে মাইক খুলে নেওয়া হলো আর তার চাইতে অনেক বেশি মাইক লাগিয়ে সেই পরীক্ষার মধ্যেই যে জলসা চলছে সে খবরটা করুন।’’ উত্তর এল ‘‘লাভ নাই, মুসলমানদের বিরুদ্ধের কোনো খবর চ্যানেল দেখাবে না।’’ এভাবেই আছে হিন্দু এই জেলায়; অপমান, লাঞ্ছনা, আঘাত, ক্ষতি, ত্যাগ স্বীকার করে শান্তির স্বর্গে। হিন্দুত্বের পোস্টার বয় নরেন্দ্র মোদী ভারতের শাসন ক্ষমতার দোরে পৌঁছতেই এবার একটু সম্মানের সঙ্গে মানুষের মতো বাঁচতে চাইছে, বুকভরে নিশ্বাস নিতে চাইছে। স্বাভাবিক, বিভিন্ন কারণে দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া হিন্দুরা শুধু শুধুই নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বের ভারতীয় জনতা পার্টিকে এই বিপুল সমর্থন দিয়ে জিতিয়ে আনেনি। শুধু উন্নয়ন আর সততার জন্যেও না। নেতারা লুটে-পুটে খাবে, দাদাগিরি দেখাবে সেটা দেশের মানুষ খুব স্বাভাবিক করে নিয়েছে, কেউ তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। উন্নয়ন ও সুশাসন ওই দল পূর্বেও দিয়েছে, শ্রী আদবানী-সহ ওই দলের অন্যান্য অনেক প্রথম সারির নেতারই সততা ও যোগ্যতার প্রশ্নের অবকাশ নেই। তবুও সকলকে ছাপিয়ে হিন্দুর মোদী-আবেগের কারণ প্রধানত তিনটি। (১) অস্বাভাবিক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে মানুষের যে দুর্দশা তা থেকে পরিত্রাণের আশা। (২) কর্মসংস্থান। (৩) অন্য দলগুলির অনৈতিক সংখ্যালঘু তোষণে বীতশ্রদ্ধ হিন্দুরা তাঁর ও তাঁর দলের মধ্যে এত দিনের এই লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের স্বরূপ দেখেছে এবং প্রতিবাদের সময় এসেছে তা মনে করেছে। তাই সমস্ত অন্যায়, লাঞ্ছনা আর অপমানের হাত থেকে মুক্তি পেতে এতদিনের লালিত নিজ নিজ রাজনৈতিক মতাদর্শ, গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়গত উচ্চ-নীচের বিভেদকে দূরে সরিয়ে রেখে মোদীর নামে সারা ভারত জুড়ে পদ্ম ফুটিয়েছে। কিন্তু এই বাংলার এই ফলকামী হিন্দুরা যারা সবার আগে গোঁফে তেল লাগিয়ে কাঁঠাল খাবার জন্য তৈরি হয়ে গেছে তারা এই মহাবিপ্লবে কি করেছে? প্রায় কিচ্ছু না বললেই চলে। আর এই মুর্শিদাবাদের এই হিন্দুরা? যাঁরা মনে করে এই অসহনীয় পরিস্থিতি থেকে বাঁচার পথ নরেন্দ্র মোদী ও তাঁর দলের কাছে সেই প্রত্যাশা করে, তাঁরা নিজেদের সেই প্রত্যাশা পূরণের জন্য কি করেছে? জেলার তিনটি লোকসভা কেন্দ্রেই মোদীর দলের জামানত বাজেয়াপ্ত করে ছেড়েছে। তাই দূর থেকে কয়েকজনকে কিছু কাটাকাটি করতে দেখে কি কাটছে জিজ্ঞাসা করার উত্তরে আমার এক বন্ধুবর যখন বললেন ‘‘না না গোরু কাটছে না, আর সাহস পাবে না আশা করছি। এবার আমরা মেরুদণ্ড সোজা করে একটু নিশ্চিন্তে নিশ্বাস নিতে পারব, তাই তো?’’ উত্তরে বললাম, ‘‘তা মেরুদণ্ড সোজা করে বাঁচার জন্য কি করছে?’’ উত্তর এল, ‘‘আমরা আর এখানে কি করতে পারি!’’ ঘৃণায় আমার মুখ থেকে বেরোলো, ‘‘মানুষ তো নিজের নিজের কর্মফল ভোগ করে, তাই তার বেশি আশা না করাই ভালো। যে বৃক্ষের ছায়া আশা করছি সে বৃক্ষ তো আমরা রোপণ করিনি।’’ ■

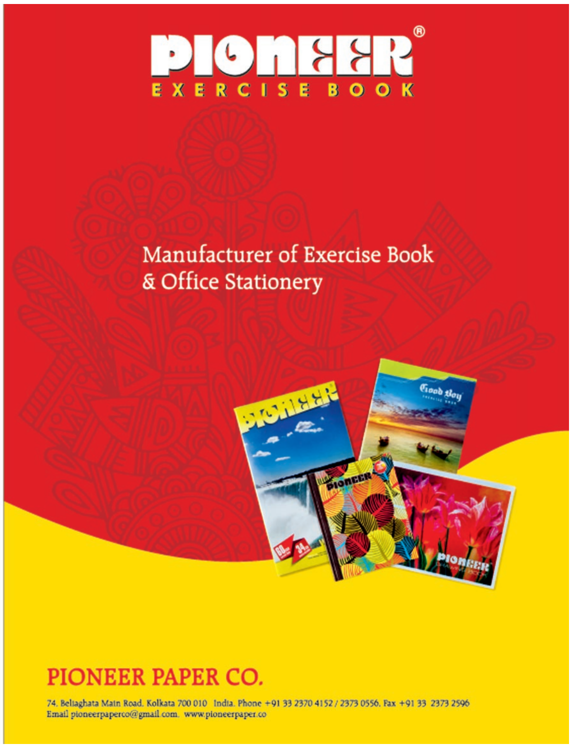

কোটিপতি হোন!
নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন
মিউচুয়াল ফাণ্ডে SIP করুন
১০০০ টাকা প্রতি মাসে যারা ১৯৯৫ সাল থেকে ২০১৩ পর্যন্ত
SIP-তে নিয়মিত বিনিয়োগ করেছেন তাদের প্রত্যেকের
ফান্ড ভ্যালু বর্তমানে ৩২ লাখ টাকা।
যোগাযোগ ঃ দেবাশিষ দীর্ঘাঙ্গী, শুভাশিষ দীর্ঘাঙ্গী
DRS INVESTMENT
Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond
9830372090
9433359382
মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ বাজারের ঝুঁকির শর্তাধীন। যোজনা সংশ্লিষ্ট সমস্ত নথি যত্ন সহকারে পড়ুন।

বিষম ধাতুর মিলন ঘটায়ে বিজেপি দিয়েছে বিয়া

অমলেশ মিশ্র

"বিষম ধাতুর মিলন ঘটায়ে বাঙালী দিয়েছে বিয়া
মোদের নব্য রসায়ন শুধু গরমিলে মিলাইয়া।"

কবি সত্যেন্দ্রনাথের— 'বাঙালী' কবিতা থেকে উদ্ধৃত এই দুটি চরণের মধ্যে 'বাঙালী' শব্দটির স্থলে 'বিজেপি' শব্দটি বসিয়ে একবার পাঠ করুন। দেখবেন ভারতীয় রাজনীতিতে কি বিশাল পরিবর্তন ঘটেছে হিন্দু জাতীয়তাবাদের আংশিক জাগরণের ফলে।

দুই পরস্পর-বিরোধী শক্তি কংগ্রেস এবং বামদলগুলি ২০০৪ সালে সারা ভারতে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল— কেবলমাত্র বিজেপিকে রোখার জন্য। লালুপ্রসাদ মুলায়ম সিং নামের দুই যাদব নেতা কংগ্রেসের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল ২০০৯ সালে। ২০১৪ সালে দেখা গেল— বাঙালির পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম এবং তৃণমূল ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে বিজেপিকে রোখার উদ্দেশ্য নিয়ে।

২০১৪-র নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস সকলকেই মেরে পিটে ভোট লুঠ করেছে। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন বলে ওই দল ৪২ আসনের মধ্যে ১৫টির বেশি আসন পেতই না। তাদের এই মারপিটের বিরুদ্ধে সব থেকে সরব সিপিএম। আর বামেদের ৩৪ বছরের রাজত্বের সব থেকে বড় ক্রিটিক (critic) তৃণমূল কংগ্রেস। এক কথায়, এরা পরস্পর বিরোধী— কবির ভাষায় 'বিষম ধাতু'। বিজেপি ভীতিই এই বিষমদের মিলন ঘটাল।

দ্বিতীয় আমরা দেখতে অভ্যস্ত হয়েছি যে সরকার গঠনের তথা ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য নীতি-আদর্শ বিসর্জন দিয়ে জোট গঠিত হয়েছে— আমরা ইংরাজিতে বলেছি কোয়ালিশন সরকার, বাংলায় বলেছি মিলিজুলি সরকার। ২০১৪ সালের নির্বাচনের পর দেখা গেল— সরকার গঠনের জন্য কোয়ালিশন দরকার নেই। এখন সরকার বিরোধিতার জন্য কোয়ালিশন হচ্ছে। এই কোয়ালিশনের মূল উদ্দেশ্য হিন্দু বা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিরোধিতা।

সেমেটিক প্রভাবে প্রভাবিতরা খৃস্টান এবং ইসলাম সংস্কৃতিকে ভারতীয় সংস্কৃতির থেকে অধিক মূল্য দিয়ে থাকেন। ফলে ভারতের রাষ্ট্র ও শিক্ষা ব্যবস্থায় হিন্দু সংস্কৃতির কোনো গুরুত্ব নেই। ওই বিষয়টি কেউ উত্থাপন করলেই ওঁরা সঙ্গে সঙ্গে হৈচৈ ফেলে দেন, গেল গেল রব তোলেন। রাজনীতির লোকেরা বক্তৃতা দেন— হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার বিপদ সম্পর্কে, সংবাদমাধ্যম অত্যন্ত বিচলিত হয়ে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা বড় দাঙ্গা ঘটাতে পারে তার হিসাব লিখেন, শিক্ষকমশাইরা ও বিদ্বজ্জনেরা টিভির আসরে 'হিন্দু মৌলবাদ' শিরোনামে আলোচনা করেন। এতে ওঁদের লাভও হয় এবং সে লাভটা আর্থিক।

প্রসঙ্গত, কমিউনিস্ট পার্টি (এম)-র মুখপত্র গণশক্তিতে ৮ জুন তারিখে শ্যামল চক্রবর্তী কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বলবৎ রাখার জন্য ওকালতি করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে কাশ্মীরের একটি ঐতিহ্য আছে যা ৩০০০ বছরের পুরনো। তিনি বলেছেন— কাশ্মীর শৈব দর্শনের জন্মভূমি, বৌদ্ধ দর্শনের বিস্তার কেন্দ্র এবং ইসলামী সুফি দর্শনে প্রভাবিত। তিনি লিখেছেন যে ৩৭০ ধারা বাতিল করলে সন্ত্রাসবাদ আরও বাড়বে। তিনি একথা বলেননি যে কাশ্মীর থেকে হিন্দুরা কেন বিতাড়িত হয়েছে। ৩০০০ বছর ব্যাপী যে কাশ্মীরের ইতিহাস আছে, যে কাশ্মীর শৈবদর্শনের জন্মভূমি সেই কাশ্মীরে কেন হিন্দুরা থাকতে পারবে না? তিনি একথাও বলেননি যে সন্ত্রাসবাদকে শান্ত রাখার কৌশলে হিসাবে ৩৭০ ধারাই একমাত্র অস্ত্র কিনা?

এই ধরনের বহু রাজনৈতিক নেতাই আছেন যাঁরা সন্ত্রাসবাদকে প্রশ্রয় দেবেন এবং হিন্দু-জাতীয়তাবাদকে সাম্প্রদায়িকতা বলবেন। কিন্তু ২০১৪ সালের নির্বাচনে দেখা গেল যে মুসলমানভোট বিভক্ত হচ্ছে আর হিন্দুভোট ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে। এতকাল দেখা গেছে হিন্দু ভোট বহুধা বিভক্ত এবং সেই কারণেই মুসলমান তোষণের মাধ্যমে মুসলমান ভোট পক্ষে আনার জন্য দলগুলি মরিয়া হয়ে উঠেছিল। এরা দেশবাসীকে হিন্দু এবং মুসলমান এই দুই রং ব্যতীত অন্য কোনো ভাবে দেখতে চায় না, দেখাতেও চায় না। মোদী সরকারের কাজের বিচার তারা করে--- ওই বিশেষ কাজটি কতটা মুসলমানদের বিপক্ষে আর কতটা হিন্দুদের পক্ষে। এছাড়া আর কিছুই এরা ভাবতে পারে না। তাই এদেশের মুসলমানরাও সম্ভবত সিপিএম এবং তৃণমূলকে ত্যাগ করেছে। তাদের ভাবনার মধ্যেও সম্ভবত এক জাতি, এক প্রাণ, একতার ভাবনা এসেছে। জাগ্রত ভারত, উন্নত ভারত সৃষ্টিতে এই ঐক্যবদ্ধ ভাবটিই প্রয়োজন। এদেশের রাজনৈতিক নেতারা, তথাকথিত বিদ্বজ্জন ও সংবাদমাধ্যমের পণ্ডিতরা এই বিষয়টি যত দ্রুত অনুধাবন করবেন দেশের সামগ্রিক উন্নতি তত দ্রুতই সম্ভব। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এই নির্বাচনে সর্বভারতীয় দৃষ্টিতে দেখা গেল হিন্দু বিরোধিতা ও মুসলমান তোষণ করে তৃণমূল পেয়েছে ৩.৮ শতাংশ ভোট এবং ৩৪টি আসন। (অধিকাংশই ভোট লুঠ করে) আর সিপিএম পেয়েছে ৩.৩ শতাংশ ভোট ও ৯টি আসন। এরা এই লাইনে তাদের রাজনীতি চালিয়ে গেলে এদের অবলুপ্ত হতে সময় লাগবে না।

দেশের মানুষ আর ওই গাড্ডায় পড়তে চাইছেন না। বিকাশ, উন্নয়ন ও সুশাসন এখন মানুষের একান্ত কামনা। এই কামনার বাস্তবায়ন হিন্দুদর্শন ও হিন্দু জাতীয়তাবাদই করতে পারে। জাগ্রত ভারত তৈরি করতে গেলে এই মতাদর্শই অস্ত্র। ■

সমাজ উন্নয়নের কেন্দ্র কুসুমডিহি ছাত্রাবাস

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ মধ্যপ্রদেশের ডিন্ডোরি জেলায় কুসুমডিহি গ্রাম। পাহাড়-জঙ্গলে ঘেরা। চারিদিকে সবুজের সমারোহ। এই গ্রামেই সেবা ভারতীর প্রতিষ্ঠিত বালক ছাত্রাবাস। সবাই গোণ্ড উপজাতির ছাত্র। এই ছাত্রাবাসই এতদঞ্চলের সমাজ উন্নয়নের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। পাহাড়-জঙ্গলের বনবাসীরা তাই এই ছাত্রাবাসকে মন্দির মনে করে শ্রদ্ধা জানায়। এই ছাত্রাবাস একটি বহুমুখী উন্নয়ন প্রকল্প। প্রতি সন্ধ্যায় ছাত্রাবাসের মন্দিরে গ্রামবাসী একত্রিত হয়ে ভজন কীর্তন করে। ভ্রাম্যমান চিকিৎসালয় এলাকায় ঘুরে ঘুরে মানুষের স্বাস্থ্যের খোঁজখবর রাখে।

কুসুমডিহি ছাত্রাবাসের ছাত্ররা।

আবাসিক বিদ্যালয়ে এলাকার ছাত্ররা নামমাত্র খরচে থেকে পড়াশুনা করে। গোশালা, গ্রন্থালয়, ধ্যানগৃহ, আরোগ্য কেন্দ্র ছাত্রাবাসের ছাত্রদের সমাজ পরিবর্তনের মাধ্যমরূপে কাজ করছে।

ডিন্ডোরি থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরে ডিন্ডোরি-মাণ্ডলা সড়কের ধারে এই ছাত্রাবাস ২০০৩ সালের ২৩ জুলাই প্রতিষ্ঠা হয়েছে। ২০০৬ সালে জুনিয়র হাইস্কুল শুরু হয়। এর আগেই ২০০২ সালে রাম-লক্ষ্মণ-সীতার মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়। এই ছাত্রাবাসে থেকে এলাকার ১৮৫ জন ছাত্র পড়াশুনা করে। ছাত্রাবাসের ছাত্রদের নিয়মিত শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গিও দেওয়া হয়। উৎসব বা গ্রীষ্মের ছুটির সময় পুরনো ছাত্ররা এক একটি গ্রামে গিয়ে গ্রামের মানুষদের নিয়ে গ্রামোন্নয়নের নানান দিক হাতে কলমে শিক্ষা দেয়। গ্রামে বৃক্ষরোপণ, অকারণ গাছ না কাটা, নেশা করার কুফল, কম বয়সে বিয়ে না দেওয়া, জৈবিক কৃষি ইত্যাদি বিষয়ে গ্রামের মোড়ল বা মাঝি হারামদের সঙ্গে আলোচনা করে। গ্রামের সবাই ওই সময় ছাত্রাবাসের ছেলেদের নানাভাবে আপ্যায়ণ করে।

ছাত্রাবাসের ছাত্রদের পড়াশুনার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেন ছাত্রাবাস কর্তৃপক্ষ। প্রতি বছর এদের মধ্যে থেকে পাঁচ-ছয় জন সেবা ভারতীর দিল্লী, গোয়ালিয়র বা ভোপালের ছাত্রাবাসে থেকে পড়াশুনার জন্য নির্বাচিত হয়। সেবা ভারতীর ওই ছাত্রাবাসগুলি খুবই উন্নতমানের। প্রতি বছর দু'জন ছাত্রকে বিদেশ ভ্রমণের জন্য নির্বাচিত করা হয়। ছাত্রাবাসগুলিতে সিবিএসই-র পাঠক্রম অনুসারে পড়াশুনা হয়। কুসুমডিহি ছাত্রাবাস থেকে সরকারি বিদ্যালয় মাত্র ১ কিলোমিটার দূরে। সেখানে প্রত্যেক ছাত্রকে ১৫০ টাকা, ১২ কিলোগ্রাম চাল ও ৩ কিলোগ্রাম ডাল দেওয়া সত্ত্বেও কুসুমডিহি ছাত্রাবাসে ভর্তির জন্য সবসময় ভিড় লেগেই থাকে।

বিঞ্জোরি গ্রামের কৌশল্যাবাইয়ের ছেলে এই ছাত্রাবাসে ক্লাস সেভেনে পড়ে। তিনি বলেন, ‘‘ছাত্রাবাসে ছেলেদের পড়াশুনার সঙ্গে সঙ্গে ভালো সংস্কার পাওয়ার জন্য আমরা খুবই প্রভাবিত। এখানে পড়ার জন্য আমার ছেলে অনেক ভালো ভালো নিয়ম শিখেছে। আগে তো কাউকে প্রণাম করতো না, এখন মা, বাবা ছাড়াও পাড়ার গুরুজনদেরও প্রণাম করে।’’ ধীরজ সিং ধুর্বে ছেলেকে সরকারি স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে কুসুমডিহি ছাত্রাবাসে ভর্তি করেছেন। তিনি বলেন, ‘‘এই ছাত্রাবাসের ছেলেরা খুবই সংস্কারিত দেখে আমি ছেলেকে এখানে ভর্তি করেছি।’’ বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক ও ছাত্রাবাসের পরিচালক শিবকুমার ধুর্বেও গোণ্ড জনজাতির মানুষ। তিনি স্বাভিমানের সঙ্গে জানান— ‘‘আমাদের বিদ্যালয় ও ছাত্রাবাস রাজ্যের মধ্যে বনবাসী এলাকায় প্রথম স্থানে আছে। বিদ্যালয়ে প্রথাগত শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মহাপুরুষদের জীবনকথা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সমস্ত উৎসব পালন, অভিভাবক সম্মেলন, খেলাধুলা ইত্যাদি নানা বিষয়ের আয়োজন করা হয়। আর এর ফলে এই বিশাল এলাকায় মানুষ আজ নেশার জিনিস স্পর্শ করে না। স্থানীয় থানা-পুলিশ একথা গর্বভরে উল্লেখ করে। ছাত্রাবাসের ভ্রাম্যমান চিকিৎসালয় পরিচালনা করেন ৮৪ বছরের ডাঃ রামশঙ্কর রাজপুত। এলাকার মানুষ তাঁকে ধন্বন্তরি জ্ঞান করে।

ছাত্রাবাস পরিসরে রাম-সীতা-লক্ষ্মণের মন্দির এলাকায় মানুষের কাছে সামাজিক একতা ও সদ্ভাবের কেন্দ্র তৈরি হয়ে গিয়েছে। গ্রামবাসীর কাছে আবেদন রাখা হয়েছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তি রোজ মন্দিরের দানপাত্রে ১ টাকা করে দান করবেন। বছরে প্রায় ৫০ হাজার টাকা জমা হয়। এই টাকা রামনবমী ও দোল উৎসবের সময় খরচ করা হয় এবং বাকি টাকায় ছাত্রাবাসের অন্য প্রকল্পগুলি চালানো হয়।

আজ কুসুমডিগি ছাত্রাবাস ও বিদ্যালয় এলাকায় শ্রদ্ধার কেন্দ্র হিসাবে সকলের নজর কেড়েছে।

DAS STEEL UDDYOG

Naldubi, Mangalbari, Po.+Dist. : Malda

সকল প্রকার স্টীল ফার্ণিচার,
গ্রীলগেট এবং ফেব্রিকেশনের
কাজ করা হয়

Show Room

—ঃ যোগাযোগের ঠিকানা ঃ—

GEETANJALI FURNITURE

Jhaljhalia, Station Road, Malda

Phone : 03512-266063,

Mobile : 9733387091

Ori Plast

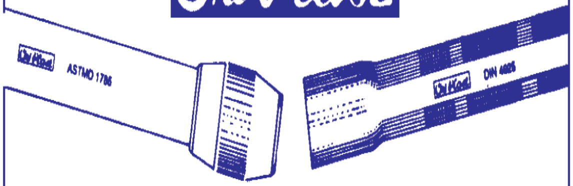

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833
3, Jadu Nath Dey Road, Kolkata-12, Ph. 2215-6804, Fax : 2212-2803

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

"আমি স্মরণ করি, ইতিহাসের সেই সর্বশ্রেষ্ঠ খ্যাতিমান পুরুষ ও নারীগণকে, একদা যাঁরা ভারতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আমি স্মরণ করি, ভারতের সেই মহান ধর্মকে, যে ধর্ম 'প্রচার'কে যথার্থ শিক্ষার ভিত্তিতে স্থাপন করেছিল। আমি স্মরণ করি, সামরিক নেতাদের মধ্যে সেই জাতীয় সম্রাট চন্দ্রগুপ্তকে, যে শূদ্ররাজের মধ্যে দুই হাজার বৎসর পূর্বে ভারত তার নেপোলিয়ান বোনাপার্টকে সৃষ্টি করেছিল, যে সম্রাট ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন একটি সমগ্র মহাদেশকে।"

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির শিক্ষা বর্গ

গত ৪ জুন থেকে মালদা অরবিন্দপার্ক সরস্বতী শিশু মন্দিরে রাষ্ট্রসেবিকা সমিতির প্রথম বর্ষ শিক্ষা বর্গ শুরু হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক রাধাগোবিন্দ পোদ্দার এবং উত্তরবঙ্গ সহ-প্রান্তকার্যবাহ তরুণ কুমার পণ্ডিত। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রসেবিকা সমিতির প্রান্ত সঞ্চালিকা মুক্তিপ্রদা সরকার, শিবির কার্যবাহিকা গরিমা বেঙ্গানী, অভিভাবিকা বন্দনা রায়, উত্তরবঙ্গ প্রান্ত প্রচারিকা জয়া ভট্টাচার্য ও নীতা সাহা। উত্তরবঙ্গের ৫টি জেলা— শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদা থেকে ৮২ জন শিক্ষার্থী এই ১৫ দিনের বর্গে থেকে শারীরিক, বৌদ্ধিক ও মানসিক শিক্ষা গ্রহণ করে।

গত ১৯ জুন বর্গের সমাপ্তি হয়। এই বর্গে বৌদ্ধিক দিয়েছেন ক্ষেত্র কার্যবাহ সত্যনারায়ণ মুজমদার, ক্ষেত্র প্রচারক অদ্বৈতচরণ দত্ত ও অন্যান্য কার্যকর্তা। সেবিকারা গত ১৮ জুন মালদা শহরে পথসঞ্চলনের মাধ্যমে শহর পরিক্রমা করে।

হিন্দু সাম্রাজ্য দিনোৎসব

হিন্দু সাম্রাজ্য দিনোৎসব উপলক্ষে গত ১১ জুন মালদা নগর শাখার উদ্যোগে শিবাজীর রাজ্যাভিষেকের ৩৪০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান হয়ে গেল মালদা টাউন হলে। ৪০০-র বেশি নারী পুরুষে পরিপূর্ণ টাউন হলে সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত কার্যক্রম চলে। প্রধানবক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র কার্যবাহ সত্যনারায়ণ মজুমদার। সভাপতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মালদা শহরের বিশিষ্ট শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ এইচ চট্টোপাধ্যায় এবং বিশেষ অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরের শিক্ষক কামদেব মুখোপাধ্যায়। এছাড়াও উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক বিদ্রোহী সরকার ও নগর সঙ্ঘচালক সুধাংশুজ্যোতি রায় উপস্থিত ছিলেন। প্রধান বক্তা বর্তমান সময়েও শিবাজী মহারাজের জীবন ও আদর্শ যুব সমাজের কাছে কতটা গ্রহণীয় তা তুলে ধরেন। কার্যক্রমে সংস্কার ভারতীর মালদা নগর শাখা সঙ্গীত পরিবেশন করে। শেষে প্রান্ত বৌদ্ধিক প্রমুখ প্রবীর মিত্র ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

শোকসংবাদ

সংস্কৃতভারতী, দক্ষিণবঙ্গের সংগঠন সম্পাদক তথা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক প্রণব নন্দের মাতৃদেবী গত ১৭ জুন সকালে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রামে তাঁর মেয়ের বাড়িতে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। তিনি ৩ পুত্র, ৩ কন্যা ও নাতি-নাতনি রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, তাঁর অন্য দুই পুত্রও সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক। তিনি অত্যন্ত সেবাপরায়ণা ও স্নেহময়ী ছিলেন।

***

মালদহ নগরের স্বয়ংসেবক সুব্রত নাথ গত ২৩ মে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৪ বছর। তিনি মা, স্ত্রী, ২ কন্যা ও অসংখ্য গুণমুগ্ধ বন্ধু-বান্ধব রেখে যান। তাঁর অকাল মৃত্যুতে পরিবারসহ সকলেই মর্মাহত।

‘সক্ষম’-এর রাষ্ট্রীয় কার্যকরী পরিষদের বৈঠক

বিকলাঙ্গ বন্ধুদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য সমর্পিত সংগঠন সমদৃষ্টি, ক্ষমতা বিকাশ এবং অনুসন্ধান মণ্ডল (সক্ষম)-এর কার্যকরী পরিষদের বৈঠক গত ৩১ ও ১ জুন কলকাতার হরিয়ানা ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকের উদ্বোধন করেন সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র প্রচারক অদ্বৈতচরণ দত্ত। সভাপতিত্ব করেন সক্ষমের কেন্দ্রীয় সভাপতি ডঃ মিলিন্দ মাধব কসবেকর। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন কেন্দ্রীয় সম্পাদক রামজী গুপ্তা।

এই বৈঠক উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত প্রতিনিধিদের শ্রী দত্ত বলেন, সঙ্ঘ নিজে কিছু করে না, স্বয়ংসেবকগণই সবকিছু করেন; সঙ্ঘ কেবলমাত্র ব্যক্তি নির্মাণ এবং রাষ্ট্র হিতের কাজ করে থাকে। সক্ষম মাত্র ছয় বছরে প্রায় সারাদেশে সমস্ত প্রকারের বিকলাঙ্গের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য স্থানীয় সমিতি গঠন করে যে কাজ করে চলেছে তা মনে রাখার মতো। সভাপতি ডঃ কসবেকর দেশের সমস্ত প্রান্তে ক্ষমতা বিকাশ প্রকোষ্ঠ গঠন করে কাজ আরও সুদৃঢ় করার আবেদন রাখেন। রাষ্ট্রীয় সংগঠন সম্পাদক ডাঃ কমলেশ কুমার বলেন, যে-কোনো সংগঠনের ক্ষেত্রে সদস্য বৃদ্ধি, কার্যক্রম এবং স্থানীয় সক্রিয় সমিতি উন্নতির লক্ষণ হিসাবে গণ্য হয়। তিনি ভারত সরকারের কাছে দাবি করেন ‘কুষ্ঠরোগ’ এখন থেকে নির্মূলযোগ্য এবং ছোঁয়াচে রোগ নয়’ এবং ১৮৯৮ আইনের সংশোধন করে কুষ্ঠরোগ-মুক্ত রোগীদের সাধারণ জনজীবনে যুক্ত করা যায় তার সুযোগ করে দেবার জন্য। সর্বসম্মতিতে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়। রাষ্ট্রীয় সম্পাদক শ্রীরামজী গুপ্তা বলেন, সব প্রদেশে কমপক্ষে ১টি স্থায়ী প্রকল্প চালানো প্রয়োজন।

এই উপলক্ষে রাষ্ট্রীয় উপাধ্যক্ষ কাশীনাথ সেক্কারাজু, সহ সম্পাদক কে. গঙ্গাধরন এবং রাষ্ট্রীয় কোষাধ্যক্ষ অরুণ বাজোরিয়া নিজস্ব বক্তব্য রাখেন। বৈঠকে স্থির হয় বিদর্ভ প্রান্তের প্রসিদ্ধ সন্ত গুলাবরাওজী মহারাজের স্মৃতি শতাব্দী বর্ষ সারাদেশে পালন করা হবে।

সমাপ্তি অনুষ্ঠানে দক্ষিণ বঙ্গপ্রদেশ সভাপতি ডাঃ সনৎ কুমার রায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন, সম্পাদক অরিন্দম উপাধ্যায়ের বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতের সঙ্গে বৈঠক সমাপন হয়।

মালদহে পরাবর্তন অনুষ্ঠান

গত ৭ জুন মালদা জেলার হরিরামপুর ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের বার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে মোট ৮টি পরিবারের ৪০ জন খৃস্টান পুনরায় হিন্দুধর্মে ফিরে আসেন। এই অনুষ্ঠানে রায়গঞ্জ ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের অধ্যক্ষ স্বামী নিরঞ্জনানন্দ মহারাজ উপস্থিত ছিলেন।

গত মাসে জেলার অন্য দুটি স্থান— তাজপুর ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে ৩ পরিবারের ১৫ জন এবং পোপড়া আশ্রমে ১ পরিবারের ৬ জন খৃস্টান স্বধর্মে ফিরে এসেছেন।

এই ৩টি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ধর্মজাগরণ সমন্বয়ের জেলা সভাপতি অলোক কুমার দাস ও সদস্য নরসিং প্রসাদ গুপ্ত, প্রান্তীয় সংযোজক গঙ্গাপ্রসাদ মুর্মু, সঙ্ঘের সহ-প্রান্ত কার্যবাহ তরুণকুমার পণ্ডিত এবং প্রদেশের সদস্য রাধাগোবিন্দ পোদ্দার।

৩টি অনুষ্ঠানই পরিচালনা করেন জেলা সংযোজক অ্যাডভোকেট অমরেশ দত্ত। তিনি ঘোষণাপত্রে (এফিডেবিট) সই করান।

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

স্বস্তিকা

গ্রাহক হোন, গ্রাহক করুন

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৪০০ টাকা

রামকেলী মেলায় মহাপ্রভুর মূর্তি প্রতিষ্ঠা

ঐতিহাসিক ও প্রাচীন বৈষ্ণব মেলা রামকেলী জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তিতে মালদহের গৌড়ে শুরু হলো। এই বছর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর রামকেলী ধামে পদার্পণের ৫০০ বছর পূর্তি উৎসব পালিত হচ্ছে। এই উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর স্মৃতি বিজড়িত তমাল গাছের নিকটে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ১১ ফুট উঁচু এক পূর্ণাবয়ব মূর্তির উদ্বোধন হয়ে গেল গত ১৪ জুন।

উপস্থিত ছিলেন যাদবেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, ডঃ তুষারকান্তি ঘোষ, কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী, জেলাশাসক শারদ দ্বিবেদী, জেলা পুলিশ সুপার প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। সারা উত্তরবঙ্গের সব জেলা থেকে যেমন বৈষ্ণব ভক্তের এই রামকেলী মেলাতে পদার্পণ হয়, তেমনি ওপার বাংলাদেশ থেকেও বহু হিন্দু ভক্ত এই মেলাতে আসেন। প্রথমদিনে প্রচণ্ড গরম ও রৌদ্রকে উপেক্ষা করে হাজার হাজার ভক্তের ঢল নেমেছিল রামকেলী মেলাতে।

শিলিগুড়িতে ড. দীনেশচন্দ্র সিংহ এবং প্রবীণ প্রচারক রাকেশজীর স্মরণসভা

গত ২০ জুন সন্ধ্যা সাতটায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ প্রাদেশিক কার্যালয় মাধব ভবনে সদ্য প্রয়াত প্রবীণ প্রচারক রাকেশ কুমার (সর্বভারতীয় সংযোজক, সীমা জনকল্যাণ মঞ্চ) এবং স্বনামধন্য প্রাবন্ধিক ও প্রখর হিন্দুত্বের প্রবক্তা ড. দীনেশচন্দ্র সিংহের স্মরণসভায় আন্তরিক শ্রদ্ধা ও পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করা হয়।

শ্রদ্ধার্ঘ প্রদান করে স্মৃতিচারণ করেন দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচিত সদস্য সুরিন্দর সিং আলুওয়ালিয়া, ক্ষেত্র প্রচারক অদ্বৈতচরণ দত্ত, শিলিগুড়ি সহ-বিভাগ সঙ্ঘচালক কুলছত্রপ্রসাদ আগরওয়াল, প্রান্ত প্রচারক গোবিন্দ ঘোষ, বিভাগ প্রচারক বাদল দাস প্রমুখ।

শ্রী আলুওয়ালিয়া বলেন, ভারতমাতার জন্য নিবেদিত প্রাণ প্রচারক। জম্মু-কাশ্মীরে কাজ করার পর সীমান্তের কাজের দায়িত্ব ছিল। সাফল্যের সঙ্গে 'সরহদ প্রণাম' দেশজুড়ে তাঁর জন্য সম্ভব হয়েছিল। ক্ষেত্র প্রচারক অদ্বৈতচরণ দত্ত বলেন, 'রাকেশজী, দীনেশবাবু, তপন শিকদার, গোপীনাথ মুণ্ডেরা চলে গেলেন। আমাদের একহাতে চোখের জল মুছে অন্য হাতে তাঁদের অপূর্ণ কাজ করে যেতে হবে।'

দীনেশবাবুর স্মৃতিচারণ করে প্রান্ত প্রচার প্রমুখ বাসুদেব পাল বলেন, দীনেশবাবু ছিলেন প্রচণ্ড হিন্দুত্ববাদী ও সুলেখক।

তাঁর তির্যক ব্যঙ্গাত্মক রচনা সবার অন্তরকে স্পর্শ করত। তাঁর বিখ্যাত রচনা—'নোয়াখালির মাটি ও মানুষ' এবং সুহৃদবর অশোকবাবুর সঙ্গে লিখিত 'The Great Calcutta killing and Noakhali Genocide' একটি আকর গ্রন্থ। স্মরণসভায় শতাধিক স্বয়ংসেবক ও অন্যান্য ক্ষেত্রের কার্যকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

ভিন্ন মেজাজের চারটি গল্প নিয়ে সন্দীপ রায়ের ‘চার’

বিকাশ ভট্টাচার্য

গত বছর তিনটে ভূতের গল্প নিয়ে ‘যেখানে ভূতের ভয়’ চিত্রিত করার পর মনে হয় পরিচালক সন্দীপ রায় বাংলা ছোট গল্পে মজে গেছেন। আর মজবেন নাই বা কেন, বাংলা ছোট গল্পের ভাণ্ডারে যা মণিমুক্তো আছে তার সন্ধান যিনি পেয়েছেন, তিনি যে তা থেকে চোখ ফেরাতে পারবেন না সেটাই স্বাভাবিক। তবে একটা গোটা উপন্যাসকে সেলুলয়েডে রূপ দেওয়া যতটা সহজ, ছোট গল্পের মেজাজকে অক্ষুণ্ণ রেখে অর্থাৎ মূল গল্পের নির্যাস সযত্নে সিনেমাটিক করে গল্পের চমকটা দর্শকদের সামনে তুলে ধরা বেশ কঠিন। আর সেই কঠিন কাজটিতেই সসম্মানে উতরে গেছেন পরিচালক সন্দীপ রায় তাঁর সাম্প্রতিক ‘চার’ ছবিতে।

ছবির গল্পকার যখন রাজশেখর বসু (পরশুরাম), শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সত্যজিৎ রায় তখন সেই ছবি যে বাজার চলতি আর পাঁচটা বাণিজ্যিক ছবির থেকে আলাদা হবে তা বলাই বাহুল্য। বর্ণনার অতিরঞ্জন নেই, নেই ঘটনার ঘনঘটা— সহজ গল্প সহজভাবেই চলচ্চিত্রের ভাষায় বলে গেছেন অবলীলাক্রমে। এখানেই পরিচালকের স্বকীয়তা, যা সন্দীপ রায় তাঁর পিতার কাছ থেকে অর্জন করেছেন।

পরশুরামের ‘বটেশ্বরের অবদান’-এ লেখক বটেশ্বরকে প্রাতঃভ্রমণের সময় ধরেন এক যুবক (শুভ্রজিৎ দত্ত)। তার অনুরোধ বটেশ্বরের ধারাবাহিক উপন্যাসের নায়িকাকে মৃত্যুশয্যা থেকে ফিরিয়ে আনতে হবে। ওই একই দাবি এক ডাক্তারও করেন বেশ মেজাজ দেখিয়ে। বটেশ্বর স্পষ্ট বলে দেন তা অসম্ভব। কারণ তার গল্পের পরিণতি ট্র্যাজিক। কিন্তু এক অভিনেত্রী (শ্রীলেখা মিত্র) যখন লাস্যময় ভঙ্গিতে একেবারে গায়েপড়ে একই অনুরোধ করেন, তখন বটেশ্বর গলে যান এবং উপন্যাসের মৃত্যুপথযাত্রী নায়িকা অলকা সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে যান। গল্পের শেষ মোচড়টা কিন্তু বলে দিলে ছবি দেখার মজাটাই নষ্ট হবে। তাই ওটা পাঠকদের হাতেই ছেড়ে দিলাম।

সত্যজিৎ রায়ের ‘দুই বন্ধু’ : রজতাভ ও পীযূষ

পরশুরামের ‘বটেশ্বরের অবদান’ : পরান ও শাশ্বত

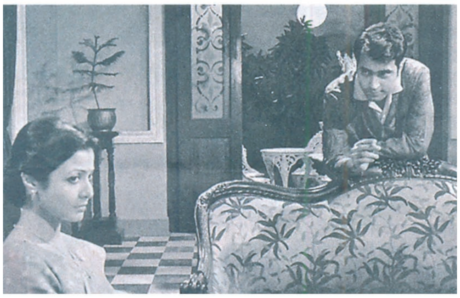

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পরীক্ষা’ : কোয়েল ও আবির

সত্যজিৎ রায়ের ‘কাগতাড়ুয়া’ : শাশ্বত

ডাক্তারের ভূমিকায় শাশ্বত চট্টোপাধ্যায় দারুণ। তবে এই ছবিতে লেখক বটেশ্বরের ভূমিকায় পরান বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় অসাধারণ। তার সঙ্গে যোগ্য সঙ্গত করেছেন ক্যামেরাম্যান শীর্ষ রায়। প্রথম দৃশ্যে বৃক্ষরাজির মাঝে বটেশ্বরের হেঁটে যাওয়ার দৃশ্য মুগ্ধ করে আমাদের।

দ্বিতীয় গল্প সত্যজিতের ‘কাগতাড়ুয়া’। এক গায়ক ফাংশন করে ফিরছেন। মাঝ রাস্তায় গাড়ির তেল ফুরিয়ে গেল। ধু ধু ধান ক্ষেতের ধারে গাড়ি রেখে ড্রাইভার তেল আনতে গেল। গায়ক সামনের ক্ষেতের মধ্যে দাঁড়ানো কাগতাড়ুয়াকে যেন এগিয়ে আসতে দেখেন। সামনে দাঁড়ায় তার পুরানো ভৃত্য যাকে চুরির দায়ে তিনি তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, যে হদিশ দেয় সেই চুরি যাওয়া বস্তুটির। যা বাড়ির আলমারিতেই পাওয়া যায়। গায়কের ভূমিকায় শাশ্বত চট্টোপাধ্যায় এবং ভৃত্যের ভূমিকায় নিমাই ঘোষ যথেষ্ট ভালো অভিনয় করলেও গল্পটি সেলুলয়েডে তেমন দানা বাঁধেনি। সেই তুলনায় সত্যিজিতের ‘দুই বন্ধু’ গল্পটি বেশ সিনেমাটিক লাগে। দুই বন্ধু স্কুলজীবনের পঁচিশ বছর পর পূর্ব নির্ধারিত দিনে দেখা করে। সেই নাটকীয় সাক্ষাৎই ছবির মূল ঘটনা। এই ছবিতে রজতাভ দত্ত অবাক করেছেন। একদিকে সরল এক বন্ধু অন্যদিকে মুম্বাই-এর জনপ্রিয় অভিনেতা কিশোরীলাল। অপূর্ব অভিনয় দক্ষতায় রজতাভ চরিত্রটিকে দাঁড় করিয়েছেন। অন্য বন্ধু ও তার স্ত্রীর ভূমিকায় পীযূষ গাঙ্গুলী ও সুদীপ্তা চক্রবর্তী যথাযথ।

ছবির শেষ গল্প শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পরীক্ষা’। ঘটনা চল্লিশ দশকের। সেইমত মেকআপ, আসবাব, সঙ্গীত রাখা হয়েছে। আবীর চট্টোপাধ্যায় তাঁর স্বাভাবিক অভিনয় করেছেন। কোয়েল মল্লিক তাঁর গতানুগতিক বাণিজ্যিক ছবির নায়িকার অভিনয় থেকে বেরিয়ে গল্পে নায়িকা মিস্ মণিকা মিত্রের ভূমিকায় নিজেকে মেলে ধরেছেন। সাদা কালোর তোলা এই ছবির আলোর ব্যবহার অনবদ্য।

প্রত্যেকটি গল্পের মেজাজ আলদা আলাদা, তার শেষের মোচড়েও পার্থক্য আছে। খুব সহজভাবে পরিচালক সন্দীপ রায় তাঁর সাম্প্রতিক ‘চার’ আমাদের উপহার দিয়েছেন। ছবি দেখতে বসে নব্বই মিনিট দেখতে দেখতে শেষ হয়। ইন্টারভ্যাল না দিলেও ক্ষতি ছিল না।

‘অলিম্পিক ডে’ সভ্যতার জিয়নকাঠি

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

তুরীয়ান, তুঘীয়ান, বলীয়ান বা সিটিয়াস, অলটিয়ান, ফরটিয়াস শব্দগুলির সঙ্গে বাঙালি মানস খুব একটা পরিচিত নয়। এগুলি আদতে গ্রীক শব্দ যা লাতিন উদ্ভূত। অর্থ— আরো উঁচুতে, আরো জোরে ও আরো শক্তিশালী। আর এই শব্দগুলির ব্যাঞ্জনা যে সভ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞান অলিম্পিকের সঞ্জীবনী মন্ত্র। অলিম্পিক আন্দোলনের সঙ্গে আজ গোটা বিশ্বের মানুষ একাত্ম অনুভব করে, কারণ এ হলো সভ্যতার রক্ষাকবচ তথা জিয়নকাঠি। ২৩ জুন দিনটি অলিম্পিক ডে হিসেবে পালিত হয় গোটা বিশ্ব জুড়ে। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি এই দিনটিতে মানবজাতিকে মনে করিয়ে দেয় এর তাৎপর্য ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট। র‍্যালি, সেমিনার, আলোচনাসভা, নানান ধরনের খেলা ও ব্যবস্থাদির মাধ্যমে আই ও সি-র অনুমোদিত সব দেশের অলিম্পিক সংস্থা নিজ দেশে দিনটির সফল উদ্‌যাপনে ব্রতী হয়।

প্রাচীন গ্রীসে দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী ধরে চলেছিল অলিম্পিয়াড। পরে অবশ্য তা বন্ধ হয়ে যায়। আবার ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্বে ফরাসী দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ ব্যারন পিয়ের দ্য কুবার্তিনের হাত ধরে পুনরুজ্জীবন ঘটল আধুনিক অলিম্পিকের। তখন ইউরোপ আধুনিক নবজাগরণ শুরু হয়ে গেছে। যা চূড়ান্ত সার্থকতা লাভ করে আধুনিক অলিম্পিকের প্রাণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। কুবার্তিন বৃটিশ, জার্মান ও নিজ দেশের প্রত্নতত্ত্ববিদ, ঐতিহাসিক ও সমাজ সংস্কারকদের সহযোগিতায় প্রাচীন গ্রীসের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসবের দিকচক্রবাল খুঁজে পেলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে তুমুল আলোড়ন পড়ে গেল ইউরোপ জুড়ে। যার ঢেউ আছড়ে পড়েছিল

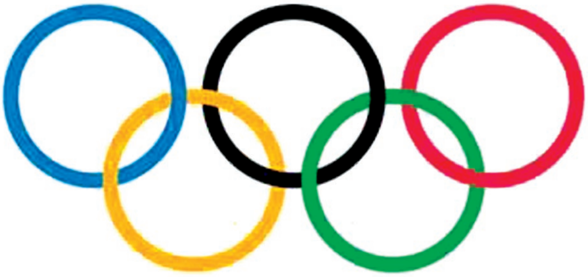

আটলান্টিকের অপর পাড়েও। অলিম্পিকের নব জাগরণের পথ প্রশস্ত করতেও তা যাতে আজীবন সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে তার জন্য কুবার্তিনের নেতৃত্বে ব্যাপক প্রস্তুতি পর্ব শুরু হয়ে গেল।

ঠিক হলো ইউরোপ, আমেরিকার প্রতিনিধিদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হবে অলিম্পিক কংগ্রেস। ১৮৯৩-এর ২৭ নভেম্বর আমেরিকার নিউইয়র্কে এই প্রস্তুতি কমিটির প্রথম বৈঠক বসে। পরের বছর লন্ডনে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বৈঠকে নির্ধারিত হয় অলিম্পিক কংগ্রেসের প্রস্তাবনাটি। সে বছরই ২৩ জুন প্যারিসের গ্রেট অ্যাম্পিথিয়েটারে বসল প্রথম অলিম্পিক কংগ্রেস। উদ্দেশ্য অলিম্পিক গেমসের পুনরুজ্জীবন। ওই কংগ্রেসে ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সব প্রতিনিধিরা যোগ দিয়েছিলেন। প্রতিটি দেশের স্ব স্ব অলিম্পিক কমিটিও গঠিত হয়। সেই থেকে ২৩ জুন দিনটি অলিম্পিক কংগ্রেস ডে হিসেবে বিবেচিত। সেই কংগ্রেসে যোগদানকারী দেশের সদস্যদের নিয়ে গঠিত হলো আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি। এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হলেন কুবার্তিন। আর গ্রীসের অলিম্পিক ঐতিহ্যের কথা মাথায় রেখে প্রথম অধ্যক্ষ মনোনীত হলেন সে দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সামাজিক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ভিমিট্রিয়াস ভাইকেলাস। কমিটিতে স্থান পেলেন আমেরিকার উইলিয়াম স্লোয়ান, রাশিয়ার জেনারেল দ্য বুটস্কি, বৃটেনের এস সি হার্বার্ট ও লর্ড অম্পটিলের মতো ইউরোপের তৎকালীন সমাজের বিদগ্ধ ও অভিজাতরা।

আই ও সি গঠিত হবার পর প্রাথমিক ভাবে এর চারটি লক্ষ্য স্থির হলো— (১) খেলাধুলাকে ভিত্তি করে মানুষের দৈহিক, নৈতিক ও সংস্কৃতিক গুণাবলীর বিকাশ। (২) যুবক-যুবতীদের মধ্যে ক্রীড়ার মাধ্যমে সমন্বয় ও ঐক্যের মনোভাব গড়া, একই সঙ্গে উন্নততর বিশ্বব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা। (৩) সারা বিশ্বে অলিম্পিকের আদর্শ ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক জীবনবোধ গড়ে তোলা। (৪) প্রতি চার বছর অন্তর এই মহান উৎসব পালনের মাধ্যমে গোটা দুনিয়াকে একত্রিত করা। এইসব লক্ষ্য সামনে রেখেই ১৮২৬ সালে গ্রীসের রাজধানী এথেন্সে অনুষ্ঠিত হয়েছিল প্রথম আধুনিক অলিম্পিয়াড। আজ শতবর্ষ অতিক্রম করে অলিম্পিক আন্দোলন সভ্যতার যাত্রাপথে সব ইজমকে পিছনে ফেলে শুধু বিশ্বজনীন বললে ভুল হবে, মহাজাগতিক হয়ে উঠেছে।

শব্দরূপ-৭১৩ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

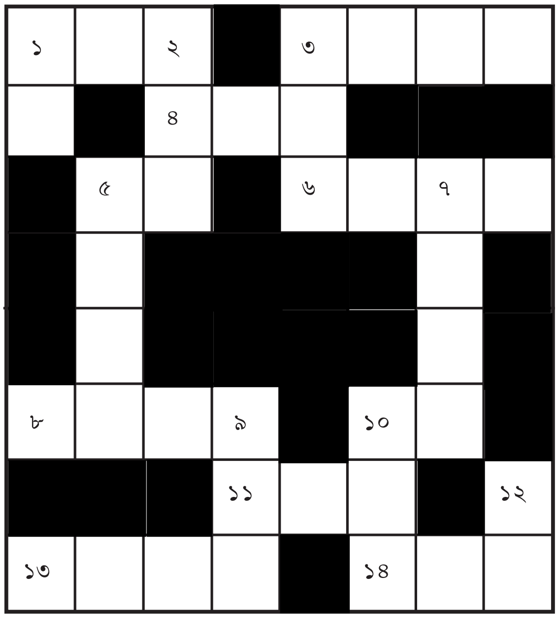

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. চণ্ডীমণ্ডপ; বৈঠকখানা, **৩.** গঙ্গাবতরণ দিন, জ্যৈষ্ঠ-শুক্ল-দশমী, **৪.** যে ঘরে বরকন্যা বিবাহরজনী যাপন করে, **৫.** রাজনীতিকরা এই জলে মাছ ধরতে নেমে পড়েন, **৬.** বুনিয়া ফুল তোলা কাপড়, **৮.** মহাবিপদসূচক দুর্লক্ষণ, ধূমকেতু, ভূমিকম্প, উল্কাপাত ইত্যাদি, **১০.** 'অরূপ তোমার—'; কথা, উক্তি, **১১.** মর্ম (পদ্যে), **১৩.** সিদ্ধান্ত, নিষ্পত্তি; জৈমিনিকৃত দর্শনশাস্ত্র বিশেষ, **১৪.** যযাতির পিতা।

উপর-নীচ : ১. প্রজাপতি বিশেষ; সতী ও ২৭ নক্ষত্রের পিতা, **২.** ছান্দোগ্য উপনিষদে উল্লিখিত সত্যকাম জাবালির জননী, **৩.** দ্বার, **৫.** রাজা উদয়নের বীণা, **৭.** দক্ষকন্যা, সতী, **৯.** রামায়ণোক্ত নদীবিশেষ; অন্ধকার, **১০.** বিষ্ণুর পঞ্চম অবতার, **১২.** রাশিচক্রের প্রথম রাশি।

সমাধান
শব্দরূপ-৭১০
সঠিক উত্তরদাতা
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯
লক্ষ্মণ বিষ্ণু
সিউড়ী, বীরভূম
সদানন্দ নন্দী
লাভপুর, বীরভূম

পূ			অ	ব	তা	র	
বা			স্বি		র		
শা	মা	পো	কা		ক	ম	লা
	লা					সূ	
	কা					রি	
গ	র	ব		স	ত্য	কা	ম
		রে		ন্যা			ডু
	চ	ন্দ্র	হা	স			ঞ্চে

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

- ৭১৩ সংখ্যার সমাধান আগামী ১৬ জুলাই, ২০১৪ সংখ্যায়

লেখক-লেখিকাদের প্রতি

- ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।
- যে কোনো রকম লেখা, তা চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন, কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন বা ফাঁক রেখে পাঠাতে হবে। অথবা টাইপ করে বা সিডি-তে পাঠালে ভালো হয়। কোনো লেখারই ফটোকপি গ্রাহ্য হবে না। লেখক বা লেখিকার নাম, পুরো ঠিকানা, ফোন নম্বর থাকা অবশ্যই দরকার এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
- চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের উপর 'চিঠিপত্র' কথাটি অবশ্যই লিখবেন। 'চিঠিপত্র' **১৫০টি** শব্দের মধ্যে হতে হবে। একই কথা প্রযোজ্য শব্দছকের ক্ষেত্রে। খামের উপর 'শব্দরূপ' লিখতে হবে।
- ভ্রমণ বিষয়ক লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি (ফটো প্রিন্ট) পাঠানো বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য ধরনের লেখার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ছবি পাঠানো যেতে পারে।
- পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা গ্রাহ্য হয় না। পুনঃ প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগই লেখা নির্বাচন করে থাকে।
- গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দু'টি বই পাঠাবেন।
- স্বস্তিকায় প্রদত্ত লেখা অন্যত্র পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে।
- লেখার মধ্যে কোনো উদ্ধৃতি থাকলে তার সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক, সংস্করণ, পৃষ্ঠা ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।
- রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/ পরিমার্জিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
- লেখার সঙ্গে মূল্যবান নথিপত্র থাকলে তা লেখক-লেখিকারা নিজ উদ্যোগে ফিরিয়ে নেবেন।

বিজয়ী বীরের প্রত্যাবর্তনে প্রজারা বিপুল অভ্যর্থনা জানালো।

পরে চন্দ্রগুপ্ত তথা বিক্রমাদিত্য হিন্দুকুশ পর্বত পার হয়ে গিয়ে কুশানদেরও পরাজিত করেন।

সমাপ্ত

আপনার এলাকায় স্বস্তিকা পত্রিকার প্রচার প্রতিনিধির নাম ঠিকানা

মুর্শিদাবাদ

- **নির্মল বিশ্বাস**
কাশিমবাজার
৯৪৭৪৬৪৫৫২৯
- **রতন চন্দ্র লোহ**
কান্দি
৯৪৭৭২১৭০৪২
- **আশিস দাস (লাল্টু)**
সাগরদিঘী
৯৪৭৪৩২১৩৭৮
৮১৪৫১০৩০৪২
- **শিবাজী দাস**
নওদা
৯৬০৯২৭৫৪৭২
৮১১৬৪২৫০৫৯
- **বিশ্বনাথ দাস**
মুর্শিদাবাদ
৯৮০০৩৫৯৪৫৬
- **জীবন প্রসাদ চৌধুরী**
রঘুনাথগঞ্জ
৯১২৬১৭৭০২০
- **শ্যামল কুমার মণ্ডল**
ফরাক্কা
৯৪৩৪৩১৫৪৭৪

নদীয়া

- **ধীমান পাল**
বড়জিয়াকুর
৯৭৩৪৭২৬৪৪৯
৮৩৮৯০৪৯৪৪৩
- **নিমাইচন্দ্র প্রামাণিক**
কালিগঞ্জ
৯২৩৩২৯৪৭৮১
- **স্বপন কুমার দে**
পলাশী
৮৫১৩০৯৫৪৯৬
- **বনমালী ঘোষ**
বহিরগাছি
৯১৫৩২২৯৩২৬
- **সুজয় সেনগুপ্ত**
চাকদহ
৯৭৩২৫৪০৭৮৫
- **বিশ্বনাথ দে**
মদনপুর
৯৭৩৫৫৭২৭৯৯

বাঁকুড়া

- **কাজলবরণ সিংহ**
গঙ্গাজলঘাঁটি
৮৬৪১০৫৫৬৫২
- **অবনীভূষণ মণ্ডল**
বাঁকুড়া শহর
৯৪৩৪৬৫০৫১০
- **সুপর্ণা শীল**
বিষ্ণুপুর
৯৪৩৪৫৪৩৮১৭
- **প্রবীর কুমার দে**
কোতুলপুর
৯৪৩৪০০৮৭৬৩
- **বলরাম সাঁতরা**
বড়জোড়া
৯৮০৪৮০১৮৫০
- **অনিলবরন রক্ষিত**
বাঁকুড়া শহর
৯৪৭৬৪১৩৬১০
- **ভীষ্মদেব মণ্ডল**
খাতড়া
৮০১৬৯২৯৭৬৩
- **তরুণ কুমার কোটাল**
কোতুলপুর
৯৪৩৪৫২১০৩৫

পুরুলিয়া

- **স্বপন হোতা**
বড়বাজার
৯৯৩২৭৪৫৮৬৮
- **অসিত কুমার দে**
পুরুলিয়া শহর
৯৬৩৫৮১০৬৮৯
- **বিজয় কালি**
রেনীরোড, পুরুলিয়া
৯৮০০৬২৭২০২
- **কাঞ্চন দত্ত**
বাগমুণ্ডি
৯৭৩৩৫৫১৮৫৬
- **গোকুল চন্দ্র নস্কর**
মানবাজার
৮১১৬৭৫০৮৮৬

বর্ধমান

- **সুকুমার দাস**
ভাটাকুল
৯৫৬৪৯৩৯২১৩
- **গণেশ ভকত**
মেমারী
৯৪৭৫২৪৪৬৪১
- **জ্যোৎস্না সৌ মণ্ডল**
উখরা
৭৬৭৯৮২০০৭২
- **বিবেকানন্দ প্রামাণিক**
শ্রীপল্লী, বর্ধমান
৯২৩২৬৭০০৪৩
- **কালাচাঁদ পাল**
বলগনা
৮৯২৬৫৬৩২৩৪
- **বিভাস মাইতি**
বর্ধমান
৯৭৩৩৭৭১৪৬৮
৯১৫৩৬৯৪৪৭৯
- **মধুসূদন দেবনাথ**
দুর্গাপুর
৯৮৩২২৮১২৪৮
- **প্রভাত মুখার্জী**
আসানসোল
৯৫৪৭৯৮৩০৮৮
- **শুভাশিস সরকার**
পানাগড়
৯৮৩২৯৬০৩৩৯
- **প্রশান্ত চিত্রকর**
আসানসোল
৯৩৩৩৫৯২৫০০
- **শান্তনু ভট্টাচার্য**
কাটোয়া
৯২৩৩০৮২৭৭৮
- **কৌশিক স্বর্ণকার**
কালনা
৯২৩২৯৩৮০১২
- **রামকানু দাসবৈরাগ্য**
রাজপুর
৮৯২৬৬৩৮৩০২
- **কৈলাশ ঘোষ**
নিগন
৮৭৯৮০৮৯৩৬৪
- **জয়ন্ত বিশ্বাস**
বিশ্বরম্ভাপুর
৮৬৪২৯৯৫০৯৮

বীরভূম

- **সনাতন চ্যাটার্জী**
নলহাটি
৯৬৭৯৮০৩০২৯
- **রামকৃষ্ণ মণ্ডল**
ময়ূরেশ্বর
৯১৫৩২৩৯১৫১
- **প্রতাপ দাস**
নলহাটি
৯১৫৩০৯২৪৫২
- **দেবাশিস ভট্টাচার্য**
সিউড়ী
৯৭৭৫৩৯৭৯৯৬
- **অসীম কুমার চৌধুরী**
বোলপুর
৮৪৭৮৮২৫১৬৩
- **বিশ্বজিৎ সিংহ**
আমোদপুর
৯১৫৩৪৭২০৪৫

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015
30 June - 2014

দাম : ১০.০০ টাকা